ইন্দিরা প্রয়াণ সংখ্যা

পরিবর্তন
৭-১৩ নভেম্বর ১৯৮৪

ইন্দিরা ঃ শেষ নমস্কারে

পরিবর্তনের
বিশেষ
প্রতিবেদনগুচ্ছ

ইন্দিরা হত্যার পশ্চাদপট

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

(এর পর তৃতীয় প্রচ্ছদে)

কিন্তু এই পুষ্টিভরা পানীয় এর আগে আপনি পাননি।

নতুন নেস্‌টোমল্ট

মধুযুক্ত ! ভিটামিনে ভরপুর !
তৎক্ষণাৎ গুলে যায় ! সুস্বাদু !

আজকের পরিবার প্রত্যেক জিনিষের উপকারিতা দাবি করে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর পানীয় দ্রব্যে। নেস্‌লের নেস্‌টোমল্ট। স্বাস্থ্যকর পানীয় নেস্‌টোমল্ট বিশেষ ভাবে আজকের পরিবারদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

দুধ এবং মল্ট-এর পুষ্টিকারক মিশ্রণ। স্বাস্থ্যকর মধুযুক্ত। এবং ভিটামিন A, D_3 এবং B_1 দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে।

পুরোপুরি তাজা স্বাদের স্পেশ্যাল 500 গ্রাম নেস্‌টোমল্ট এর টিনে আপনি পরিমাণ অনুপাতে বেশী পাবেন। নেস্‌টোমল্ট গরম বা ঠাণ্ডা, দুধ অথবা জলে সঙ্গে সঙ্গে গুলে যায়। কোনো কাঁই করতে হবে না। দলা পাকানো, বা নষ্ট হবার কোনো ঝামেলা নেই।

দেখবেন মধুবর্ণ নেস্‌টোমল্ট-এর গুণ আপনার পরিবারকে কিরকম মল্ট-এর স্বাদে মাতিয়ে রাখে।

[illegible]: ....অতি সুস্বাদু।

স্পেশ্যাল বোনাস্

প্রতি লেবেলের নীচে সুন্দর ডিজাইন করা টিন পাবেন। আপনার রান্না ঘরের জন্য জমা শুরু করুন।

Nestlé®

নেস্‌টোমল্ট

আজকের পরিবারদের জন্য অতি স্বাস্থ্যকর পানীয় নেস্‌টোমল্ট

এবার শীতে ঠক্‌ঠক্‌...
POND'S
COLD CREAM
হেসে ওড়ান শুষ্ক ত্বক!
শীতের মরশুম, বড় সুন্দর মরশুম! কিন্তু আপনার কোমল, সুন্দর ও তরুণ ত্বকের ওপর তার ব্যবহার বড়ই কঠিন ও নির্দয়। ঠিক এই সময়েই আপনার ত্বকের চাই গুণেভরা পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম—যাতে আছে বাড়তি পুষ্টিতে ভরপুর সৌন্দর্য্য তেল ও নানান সুকোমল সব উপাদান।
তাই. যেখানেই শীতের জন্যে পণ্ডসের সুরক্ষার দরকার. একটুখানি পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম মেখে নিন, আর দেখুন—আপনার লাবণ্যেভরা ত্বক কেমন নমনীয় থাকে— যা একমাত্র পণ্ডস্-ই রাখতে পারে!
POND'S COLD CREAM
POND'S
POND'S COLD CREAM
পণ্ডস্
কোল্ড ক্রীম ও
লেমন কোল্ড ক্রীম
শীতে পরিচর্যার বাড়তি পুষ্টিতে ভরপুর।
LINTAS(M) PIL-PCC 8-2720-BG

পরিবর্তন

৭ – ১৩ নভেম্বর ১৯৮৪, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১৯

প্রতি সংখ্যা ৩ টাকা

বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

অমৃতবাণী

হে প্রভাত সূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাতধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত,
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও
পরাভূত রজনীর অপমানসহ।

* * * * *

ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অংকুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

* * * * *

সৃষ্টির চলেছে খেলা
চারি দিক হতে শতধারে
কালের অসীম শূন্য পূর্ণ করিবারে
সম্মুখে যা-কিছু ঢালে পিছনে তলায় বারে বারে,
নিরন্তর লাভ আর ক্ষতি
তাহাতেই দেয় তারে গতি।

* * * * *

পরম সুন্দর
আলোকের স্নানপুণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চিরনূতনের অভিষেক
চিরপুরাতন বেদীতলে।

* * * * *

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকা-সম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সংখ্যায়়

ইন্দিরা : শেষ নমস্কারে/১০
ইন্দিরা বর্ণময় জীবন, ট্রাজিক পরিসমাপ্তি
রন্তিদেব সেনগুপ্ত/১৩
কেউ বলত স্বৈরতন্ত্রী, কেউ বলত ...../সুজিত রায়/১৫
পাঞ্জাবই ছিল শ্রীমতী গান্ধীর কঠিন সমস্যা
দিব্যজ্যোতি বসু/১৯
খুশবন্ত সিং-এর সংগে সাক্ষাৎকার/২০
গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন বহু নেতা
জয় দাশগুপ্ত/২২
ধর্মীয় রাজনীতিই কি ভারতের সংহতি বিপন্ন করছে?
অসীমপদ চক্রবর্তী/৩১
মর্মান্তিক সংবাদে মসকো মর্মাহত
মসকো থেকে চিরঞ্জীব/৩৪
আপনার অধিকার, আপনার কর্তব্য – ৪
উপেন বিশ্বাস/৩৬
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা – ৩৮/ নির্মলকুমার রায়/৩৮
স্মৃতির ইন্দিরা : ইন্দিরার স্মৃতি রমেন দাস/৪০
ইন্দিরা : তাঁর রক্ত দিয়ে তাঁর দলকে বাঁচালেন
পার্থ চট্টোপাধ্যায়/৪৩
রাজীব গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎকার/৪৭
ইন্দিরা হত্যায় দায়ী বিদেশি গুপ্তচরবাহিনী?
সুজিত রায়/৪৮
প্রতিভার নবজন্ম/ইন্দিরার ভাষণ/৫১
ইন্দিরা ভাবনা একসূত্রে/৫৩
স্মৃতির পথ বেয়ে/অ্যালবাম/৫৪
ইন্দিরা হত্যার প্রস্তুতি অনেকদিনের
নয়া দিল্লি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি/৫৮
হত্যাকারী সতবন্ত সিং অনুতপ্ত নয়
নয়া দিল্লি থেকে তরুণপ্রকাশ গংগোপাধ্যায়/৬১
রাজীব গান্ধীর পশ্চিমবংগ সফর / নিশীথ দে/৬২
জ্যোতিষ বিচারে ইন্দিরার মৃত্যু প্রায় ঠিক সময়ে
শিবরাম চক্রবর্তী/ ৬৫

প্রচ্ছদের রঙিন আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ

ইন্দিরা গান্ধীর আকস্মিক প্রয়াণে সারা দেশ আজ শোকস্তব্ধ। ইন্দিরা-শূন্যতা দেশের মানুষের মনে এখন জন্ম দিয়েছে নতুন সংশয়ের। ইন্দিরার এই আকস্মিক প্রয়াণকে কেন্দ্র করেই একগুচ্ছ প্রতিবেদন

ইন্দিরা : শেষ নমস্কারে

* * * * *

ইন্দিরার হত্যার পেছনে কোন বিদেশি কায়েমীশক্তির হাত আছে কি? এই হত্যা পরিকল্পনা কি অনেক দিনের ছক? এ নিয়েও জিজ্ঞাসার শেষ নেই। এ বিষয়েই লেখা

ইন্দিরা হত্যার প্রস্তুতি অনেক দিনের

* * * * *

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীবের আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাজীবের একটি অন্তরংগ সাক্ষাৎকারও পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে

প্রধান উপদেষ্টা : অশোক চৌধুরী • সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭২

চিফ এগজিকিউটিভ, বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ : সি এইচ বসু, কলকাতা

দিল্লি অফিস : জোনাল ম্যানেজার, নরনারন জোন : ওয়াই এ সেঠি। জনসংযোগ : শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১১, কস্তুরবা গান্ধী মারগ, নিউ দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১-২০২৪

বোম্বাই প্রতিনিধি : ডি সত্যমূর্তি : ফ্ল্যাট নং ১, বিলডিং নং ৪, টুইনক্লল স্টার কো- অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘাটলা, চেমবুর, বোম্বে ৪০০ ০৭১, ফোন : ৫৫১-৮২৬২, ৫৫১-০৫৯২

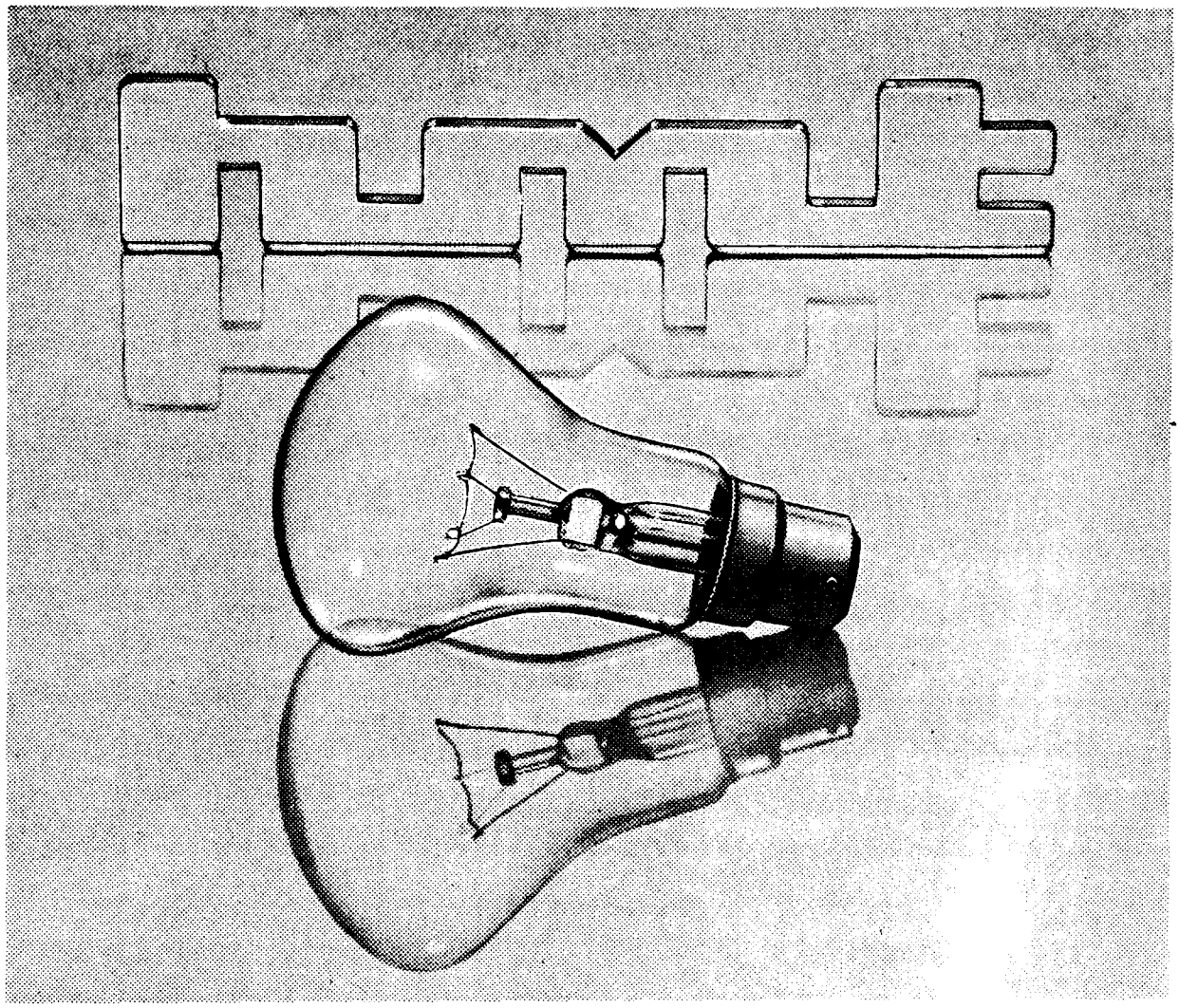

সবই দেখায় সুন্দর ঝলমলে
যখন এইচএম টি আলো জ্বলে!

জ্যোতির্ময় পথের সন্ধান যদি চান তো,
এইচ এম টি আলো জ্বালান।

এমন এক সুনামের প্রতিষ্ঠান, যাঁদের কাছে সেরা
কোয়ালিটি অম্লান রাখা ধ্যান-জ্ঞান।

আর সেইজন্যেই তো, এইচ এম টি
ল্যাম্পের প্রতিটি খুঁটিনাটি কম্পোনেণ্ট-ই
এইচ এম টি নিজে বানায়।

এমন কি, ল্যাম্প তৈরীর মেশিনটিও
এইচ এম টি'রই বানানো।

প্রতিটি ল্যাম্পই ৭৫-টি কঠিন-কঠিন পরীক্ষার
ধাপ সগৌরবে পেরিয়ে, কৃতিত্বের পদক
এইচ এম টি ছাপ বুকে নিয়ে, আপনাদের
সামনে হাজির হয়।

এসবই জ্বলন্ত প্রমাণ করে...এইচ এম টি—
চমৎকার জ্বলে ... বহুকাল চলে।

এইচ এম টি সবসময়, সবখানে ... বিচক্ষণ
সিদ্ধান্তের জ্বলন্ত প্রমাণ!

এইচ এম টি বাল্‌ব আর
ফ্লোরেসেণ্ট টিউব।

hmt Lamps আপনার জীবনের আলো।

Sista's/HMT/80/BA/ Ben

তোমার রক্তে
আমাদের বিভেদপল্হার
পাপ ধুয়ে মুছে যাক।
তোমার চিতাভস্ম থেকে
উজ্জীবিত হোক
ঐক্যবদ্ধ সোনার ভারত।

নিবেদনমিদং

৭ নভেম্বরের পরিবর্তন যখন প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় আমরা খবর পেলাম আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও শোকাভিভূত। বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে পরিবর্তনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যথেষ্টই প্রীতির ছিল। কিন্তু আমাদের সাংবাদিকদের শোকের সময় নেই। আমরা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। ৭ নভেম্বরের প্রচ্ছদপট প্রেসে পাঠান হয়ে গিয়েছিল। অবিলম্বে সেটি বাতিল করে দেওয়া হল। আমরা মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমাদের পূর্ব নির্ধারিত সমস্ত বিষয়সূচী বাতিল করে ৭ নভেম্বর পরিবর্তন ইন্দিরা সংখ্যা রূপে প্রকাশ করব। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু গেল। পরপর কয়েকদিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা ইন্দিরা সংখ্যা পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

আজ এই মুহূর্তে বারবার মনে পড়ছে শ্রীমতী গান্ধীর কথা। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হত, তখনই 'পরিবর্তন' সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নিতেন। ১৯৮৩ সালে সেপটেমবর মাসে তাঁর শেষ বিদেশ যাত্রায় তিনি একটি মাত্র ভারতীয় ভাষার পত্রিকাকে তাঁর সফর সঙ্গী নির্বাচিত করেছিলেন। সেটি হল পরিবর্তন। কয়েকমাস আগে কলকাতায় তাঁর শেষ সফরে রাজভবনে তিনি একজন মাত্র সাংবাদিককেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি পরিবর্তনের সম্পাদক। শ্রীমতী গান্ধীর জন্মদিনে পরপর কয়েকবছর আমরা বিশেষ প্রবন্ধ, প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছি। এবছরের জন্মদিনেও তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি আমাদের এই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এবং সম্ভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁর বহু নীতির কঠোর সমালোচনা করেছি। পরিবর্তনে আমরা নির্মম সমালোচনামূলক লেখাও প্রকাশ করেছি। কিন্তু তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সেকরেটারিয়েট কখনও আমাদের অনুযোগ করেননি। এই নভেম্বর মাসেই শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। কিন্তু আর কোনদিন তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে না। অনেক নেতা মনে করেন সংবাদপত্র তাঁদের স্তাবক হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগত স্তাবকতা না করলে, তাঁদের নীতির সমালোচনা করলে, এককথায় 'চামচা' সাংবাদিক না হলে ঐসব নেতারা খবর পর্যন্ত সংবাদপত্রে দিতে চান না। শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে আমরা কখন এ ধরনের ব্যবহার পাইনি।

শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুতে আমরা যেমন মর্মাহত তেমনই মর্মাহত সাম্প্রতিক হাঙ্গামায়। দেশে যদি সুস্থ, স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকে তাহলে সংবাদপত্র কখনই বিকাশ লাভ করতে পারবে না। মাত্র কয়েকদিনের গোলমালে আমাদের কাজকর্ম যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। ৩১ অকটোবরের পরিবর্তন যথা সময়ে ছাপা হওয়া সত্ত্বেও নিউজ স্ট্যানডে পৌছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ৩১ অকটোবরের পরিবর্তনে স্কুলে ছেলে ভরতি সম্পর্কে অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য ছিল। সারা পশ্চিমবঙ্গে যত আবাসিক স্কুল আছে তার তালিকা আমরা ঐ সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলাম। এছাড়া প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে ছাত্রভর্তি করতে গেলে কী ধরনের প্রশ্ন আসবে, কিভাবে ছেলেমেয়েদের তৈরি করতে হবে সে সম্পর্কেও একটি সুপরিকল্পিত মূল্যবান প্রবন্ধ ছিল। গত সপ্তাহের গোলমালে পাঠকেরা যাতে সংখ্যাটি মিস না করেন সে জন্যে বিশেষভাবে এবারে তার উল্লেখ করলাম।

অলমিতি

পা. চ.

পরিবর্তন

১৪ নভেমবর সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে কিনা, রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনগণের প্রত্যাশা কতখানি পূরণ করতে পারবেন, কংগ্রেসের মধ্যে রাজীবের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আছেন কিনা, আগামী নির্বাচনে রাজীব গান্ধী জয়ী হয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কিনা – এ সমস্ত নিয়ে রাজীব গান্ধীর সম্পর্কে পরিবর্তনের প্রতিবেদন :

রাজীব : একনায়ক না যৌথনেতৃত্ব ?

* * * * *

শ্রীমতী গান্ধী নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগামী সাধারণ নির্বাচনের চিত্ররূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নির্বাচন হলে ভারতীয় রাজনীতির চেহারাটা কী রকম দাঁড়াবে? শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুর আগে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পরিস্থিতি কেমন ছিল? নতুন পরিস্থিতিতে বিরোধী দল কি কিছু অসুবিধের মধ্যে পড়বে? শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুর আগে কলকাতার ভোটারদের মনোভাব কীরকম ছিল, এখনই বা কীরকম? এছাড়াও লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে আরো নানা তথ্য সম্বলিত বিশেষ প্রতিবেদনগুচ্ছ :

লোকসভা নির্বাচন : এখন হাওয়া কোনদিকে ?

* * * *

ভারতবর্ষে বিচারাধীন বন্দীদের ওপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। এ সম্পর্কে এক বিশেষ প্রতিবেদন।

* * * * *

এই সঙ্গে আরো ফিচার।

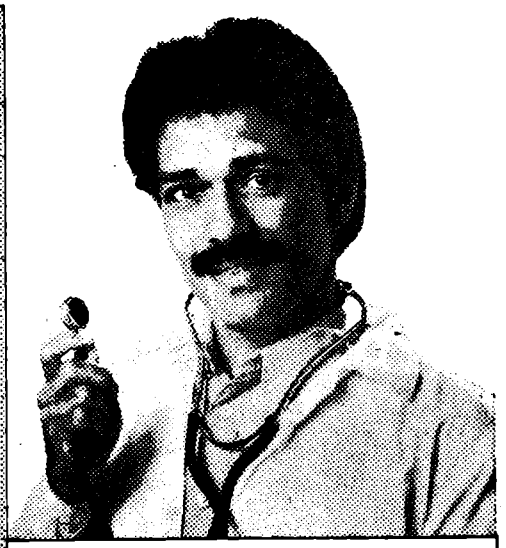

ভিটামিন

আমাদের
সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে
এদের প্রয়োজন
সবচেয়ে বেশি।

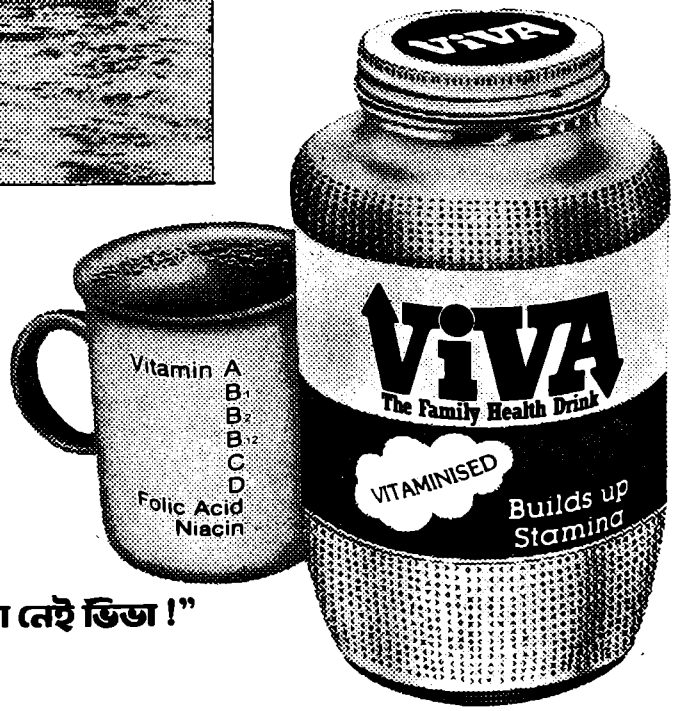

ভিভা! আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিনে ভরপুর। গম, বার্লির মল্ট ও ক্রীমযুক্ত দুধে তৈরী। ভিভা নিমেষে গুলে যায় এবং সহজে হজম হয়। আর এই সমস্তর যোগফল......

স্ট্যামিনা—যা আপনাকে তরতাজা রাখে।

তাইতো লক্ষ লক্ষ পরিবারের পরম প্রিয় ভিভা। শক্তি ও স্ট্যামিনা যোগায়···সবসময়।

"স্ট্যামিনা বজায় রাখো সদা তোমার তুলনা নেই ভিভা!"

JIL জগৎজিত ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

ASP/JIL-2/84 BEN A

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ

আপনি কি...
ভালো কোয়ালিটি পাবার জন্যে বেশী দাম দিচ্ছেন?
না, বাজে কোয়ালিটি কিনছেন?

বিজ-এর সুষমতা
গ্রহণ করুন!

দামে

আগে পরিষ্কার করার পাউডার দু'রকমের হত। এক তো খুব উঁচু কোয়ালিটির, যার দাম চোকাতে গিয়ে পকেট খালি হয়ে যায়, আর অন্যটি একদম সস্তা কোয়ালিটির, যার দাম নিশ্চয়ই কম, তবে কোয়ালিটি...মাফ করবেন!

তারপর এলো বিজ

বিজ—দামে আর কোয়ালিটিতে এক অসাধারণ সুষমতা বজায় রাখে। আসলে বিজের দাম থেকে দ্বিগুণ লাভ পাওয়া যায়, দেখুন কি করে —সুপার বিজ অন্য নামকরা পাউডারের তুলনায় ২৫% কম দামে পাওয়া যায়, আর এটি অন্য সস্তা পাউডারের চেয়ে কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়—অথচ ফল হয় তেমনিই ঝকঝকে... ঝলমলে!

কাজে

সুপার বিজে বাড়তি ডিটারজেন্ট আছে,—যা তেলচিটেভাব সহজে, আর দাগ-ময়লা-কালি নিমেষে সাফ করে। সুপার বিজে চট্ করে ফেনা হয়, তাই অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক ভালো করে আর অনেক সহজে সাফ করতে পারে।

সুপার বিজ মসৃণ বা খরখরে সবকিছুর ওপরই সমান প্রভাবশালী। স্টীলের বাসন বা কাঁচের, কাঁটা-চামচ বা সিঙ্ক আর মেঝে—প্রায় সবকিছুই এই দিয়ে সাফ করতে পারেন। পরিষ্কার করার সমস্যা যত রকমেরই হোক না কেন, তার সমাধানের জন্যে যখন বহুপযোগী সুপার বিজ রয়েইছে, তখন আর আলাদা আলাদা দামী পাউডার কেনবার দরকার কি? সাশ্রয় আর কোয়ালিটি কোনোটাই হারাবেন না! বিজের দারুণ সাশ্রয় আর দারুণ কাজের সুষমতা গ্রহণ করুন!

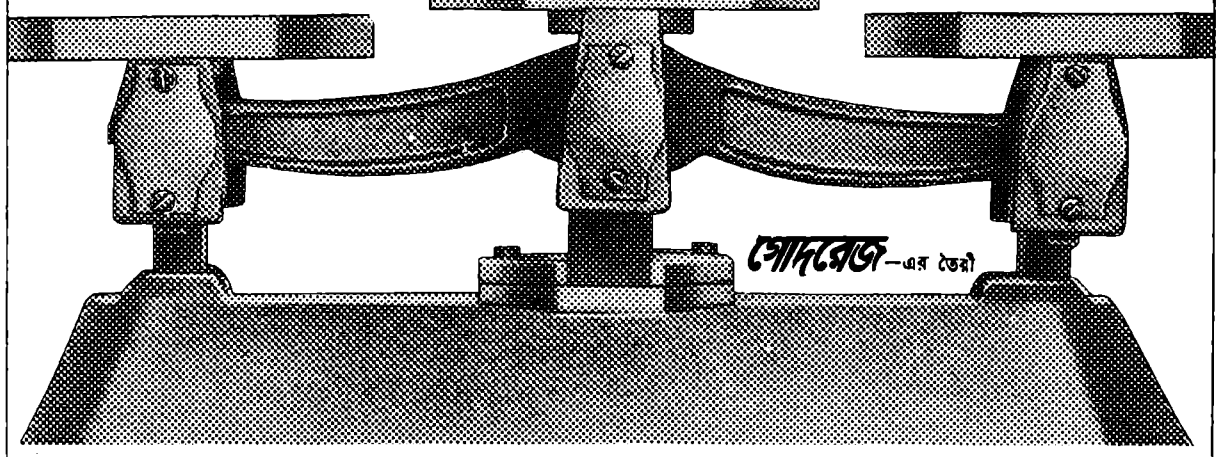

গোদরেজ—এর তৈরী

দাম কম হলে কি হয়, তেমনিই ঝকঝকে...ঝলমলে রয়!

CASGS-163-244BEN

ইন্দিরা ঃ শেষ নমস্কারে

যখন কোন জাতির শিরে বিধাতা অভিসম্পাত লিখে দেন তখন বোধহয় এইভাবেই তার শুরু হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী যে অধ্যায় মহাগুরু নিপাতের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল আজ জাতির কর্ণধার ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পূর্ণচ্ছেদ ঘটল। শ্রীমতী গান্ধীর হত্যা শুধু একটি নিছক হত্যাকান্ড মাত্র নয়, তা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরেই শেষ খড়্গাঘাত। এক জাতি এক প্রাণ একতার স্বপ্ন আজ ঘাতকের বুলেটের আঘাতে ভেঙে চুরমার।

ইন্দিরা কোনদিনই বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকাল অবিমিশ্র সুখস্মৃতির নয়। তা নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ভারতের তরংগসংকুল রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতার মধ্যে ইন্দিরা রাষ্ট্রতরণীর হালখানি দৃঢ় হাতে ধরেছিলেন। এই দৃঢ়তা, অনমনীয়তা ও কঠোরতার জন্য তিনি বিরোধীদের কাছে স্বৈরাচারী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দিরার সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল তাঁরই হাতে – সে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা। দেশে এবং বিদেশে তিনি সর্বত্র বন্দিতা হয়েছেন। বোধহয় জনতার এই অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্যই গণতান্ত্রিক উপায়ে তাঁকে বার বার পরাভূত করা দুরূহ ও দুঃসাধ্য ছিল। তাই গুপ্ত ঘাতকের হাতে বন্দুক তুলে দিতে হয়েছে তাঁর কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দেবার জন্য।

এই জঘন্য নির্মম হত্যাকান্ডের পিছনে কারা, দেশের মানুষের তা জানতে বাকি নেই। এ সেই অশুভ শক্তি যারা ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করার জন্য দিনের পর দিন চেষ্টা করে এসেছে। অবশেষে মরীয়া হয়ে তাদের এই শেষ আঘাত। এই আঘাত সামলাবার শক্তি যদি জাতির আজ না থাকে তাহলে সেই ষড়যন্ত্রকারীদেরই জয় হবে।

ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর বিপথগামী মানুষ আজ সম্পূর্ণ সংকীর্ণ স্বার্থে অন্ধ হয়ে গোটা দেশের উপরেই আঘাত হানতে উদ্যত। তাদের হিংসার রোষ থেকে কেউ রেহাই পায়নি – পুলিশ থেকে সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী থেকে দেশের নেত্রী একে একে সবাই সেই করালজিহ্বা হিংসার শিকার।

কিন্তু আজ বেদনাহত চিত্তে আমাদের প্রশ্ন – আর কতকাল দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিংসার এই রাজনীতিকে সমর্থন করে চলবেন? আর কতকাল তাঁরা এইভাবে শিকার হয়ে চলবেন ঘাতকের? এই বিরাট বিশাল মহান দেশে অমাবস্যার অন্ধকার কি চিরদিন এমন স্থায়ী হবে? এই শ্মশানে শুধুই কি নৃত্য করে চলবে ডাকিনী-যোগিনীরা?

সবচেয়ে আফশোসের কথা, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু হল তাঁর আপন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে। প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী দক্ষতম অফিসার ও বিশ্বস্ততম পুলিশ কর্মীদের দ্বারা গঠিত। কিন্তু সেই বিশেষ বাহিনীর ওপরতলার অফিসাররা এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও আগে থেকে জানতে পারলেন না, সরষের মধ্যেই ভূত থেকে গেল। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নেই সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

সমগ্র দেশ আজ অনিশ্চিত অবস্থার কবলে। দেশের সমৃদ্ধি আজ ব্যাহত হবার মুখে। ভারতবর্ষ এতদিন ধরে যে গর্ব করত তার গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের জন্য, তা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। আজ ভারতবর্ষের সামনে এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষা। সে পরীক্ষা গণতন্ত্রের। এই পরীক্ষায় যদি দেশবাসী উত্তীর্ণ হতে না পারেন তাহলে এদেশের গণতান্ত্রিক শক্তির চিরতরে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

ইন্দিরা প্রসংগে এই কথাগুলি মনে রেখে পরিবর্তন দেশের বরেণ্য নেত্রীকে জানাচ্ছে তার শেষ নমস্কার – যা কিছু বিচার বিশ্লেষণ, কিছু স্মৃতিচারণ।

: অচিন্ত্য রায়

ইন্দিরা : বর্ণময় জীবন, ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি

ইন্দিরা গান্ধী স্মৃতি হয়ে গেলেন। তবু আজ একথা বোধহয় আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যতদিন তিনি রক্তমাংসে এই পৃথিবীতে হেঁটে-চলে বেড়িয়েছেন ততদিন, অন্তত ভারতীয় রাজনীতিতে, তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। না, একথা অস্বীকার হয়ত কেউ করবেন না, তাঁর বিরোধীরাও না। যতই মতপার্থক্য, দৃষ্টিপার্থক্য থাকুক না কেন, স্বীকার সকলকেই করতে হবে ইন্দিরা শূন্যতা ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করবে। অন্তত অনেক বিরোধী নেতার কাছে এ শূন্যতা তো বড়ই কষ্টের, বড়ই প্রকট। এখন আর এমন একজন ব্যক্তিত্ব রইল না, যাঁকে কেন্দ্র করে, যাঁকে সমালোচনা করে রাজনীতিতে ঘাঁটি গেড়ে বসা যায়। ইন্দিরা ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। তিনি চলে গেলেন, ভারতের রাজনীতির বৃত্তও আজ ভেঙে গেল।

ইন্দিরার নীতির সমালোচনা বা প্রশংসা নয়, তা অনেক হয়েছে। বরং দেখা যাক কেমন ছিল তাঁর জীবন, কতখানি উত্থানপতন আর বৈচিত্র্যে ভরা। পিতা জওহরলালের হাত ধরে রাজনীতির আঙিনায় ইন্দিরার প্রবেশকে সে সময় অনেক রাজনীতি বিশেষজ্ঞই বাঁকা চোখে দেখেছিলেন। তাঁদের বিরূপ মন্তব্য ছিল, পিতার হাত ধরে রাজনীতির আঙিনায় ইন্দিরার অধিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এমনকি, ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবার পর অনেক বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতাও ভেবেছিলেন 'অপরিপক্ব' ইন্দিরার কাঁধে বন্দুক রেখে তাঁরা তা দাগতে পারবেন ভালভাবেই। কিন্তু বর্ষীয়ান নেতাদের ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা প্রমাণ করে দিয়ে জওহর তনয়া দেখিয়েছিলেন রাজনীতিতে তিনি তাঁর পিতার চেয়ে কিছু কম যান না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পিতাকে টপকেও যান।

ইন্দিরার চরিত্রে ছিল তিনটি গুণ – অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রখর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং তেমনই রাজনৈতিক বুদ্ধি। কেউ কেউ হয়ত এমন ভাবেন ইন্দিরা তাঁর গুণের অপব্যবহার করেছেন, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না, ঐ তিন গুণের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ তাঁর ভেতরে দেখা গিয়েছিল তা তাঁর পিতা জওহরলালের ভেতরেও অনেক সময় ছিল অনুপস্থিত। আর একথা তো স্বীকার্য, ইন্দিরা তাঁর নিজের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, অপব্যবহার নয়, ঐ তিন গুণেরই সুব্যবহারই করে এসেছেন বরাবর।

ইন্দিরার জীবন ছিল বর্ণময়, ছিল গতিময়। ১৯১৭ সালের ১৯ নভেমবর তাঁর জন্ম এমন একটি পরিবারে যাঁরা, সেই পরাধীনতার যুগেও পরিচিত ছিলেন আপামর ভারতবাসীর কাছে, এমনকি দেশের গন্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও। পিতামহ মতিলাল, পিতা জওহরলাল ভারতীয় রাজনীতির আকাশে বিচরণ করেছেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই। মাতা কমলা নেহরু বিরাজিত ছিলেন পিতা জওহরলালের পেছনে প্রেরণার মত। খুব স্বাভাবিক এই পরিবারের মেয়ে ইন্দিরা আপন ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন।

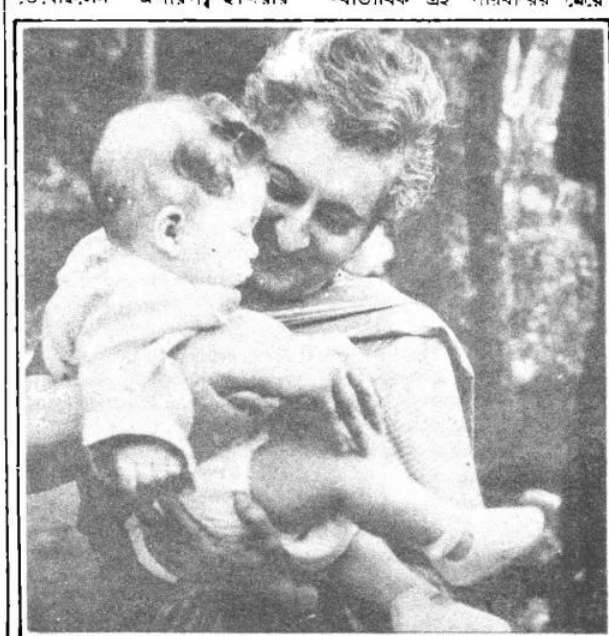

ইন্দিরার কৈশোরে তাঁর অভিভাবকেরা ব্যস্ত ছিলেন ভারতের মুক্তি আন্দোলনে। কারাগারের অন্তরালে কেটেছে তাঁদের দীর্ঘ দিন। শৈশব আর কৈশোরের অনেকগুলো দিনই প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার কেটেছে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, এলাহাবাদের বাড়িতে। অবশ্য রাজনীতির স্ফুলিঙ্গ তখন থেকেই জ্বলছিল কিশোরী ইন্দিরার মনে। অভিভাবকেরা যখন ব্যস্ত জন-সভায়, ইন্দিরা তখন বাড়ির ভৃত্যদের জড়ো করে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়া রপ্ত করতেন।

ইন্দিরার স্কুল জীবন কেটেছে কখনও এখানে, কখনও ওখানে স্কুল জীবনের শুরু দিললিতে, কিছুদিন পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে এলাহাবাদে, তারপর সুইজারল্যানডে। বারো বছর বয়সে ইন্দিরা ফিরে এলেন দেশের মাটিতে। বাবা-মায়ের জনজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না রেখে তিনিও চাইলেন গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু বয়স বড় বাধা। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারলেন না তিনি। অবশ্য তাতে দমে থাকবার পাত্রীও তিনি নন, নিজের সমবয়সী বেশ কিছু ছেলেমেয়েকে জুটিয়ে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'বানর সেনা' নামে এক বাহিনী। এই 'বাহিনী'র কাজ ছিল মুক্তি-পথিকদের বার্তা বহন করে নিয়ে যাওয়া, সত্যাগ্রহীদের খাবার-জল দেওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা করা – অর্থাৎ যতটুকু তাদের সাধ্যে কুলোয়।

এরপর তিনি আবার পড়তে গেলেন স্কুলে, এবার পুনেতে। বোমবেতে ম্যাটরিকুলেশন পরীক্ষাও দিলেন। তারপর তাঁর জীবনে এল এক পরমক্ষণ, পিতা জওহরলাল তাঁকে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে, নিবেদন করলেন বিশ্বকবির পায়ের তলায়। পিতা জওহরলালের ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতী থেকেই ইন্দিরা যেন ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন। ইন্দিরার পরবর্তী জীবনে কবির সান্নিধ্য, শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সবই ফেলেছিল গভীর ছাপ। জন্ম দিয়েছিল সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ, শিল্প সচেতনতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। জওহরলাল চেয়েছিলেন ইন্দিরার জীবনে রবীন্দ্র-প্রভাব পড়ুক, তা মিথ্যে হয়নি কোনদিনও।

এর কিছুদিন পরেই ইন্দিরাকে আবার উড়ে যেতে হল সুইজারল্যানডে, সঙ্গে মা কমলা নেহরু। কারণ, মায়ের চিকিৎসা। ফলে শান্তিনিকেতনের পড়াশোনা অর্ধসমাপ্ত রইল। পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে লিখেছিলেন, ইন্দিরার ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, আর দুঃখিত হয়েছেন ইন্দিরাকে হঠাৎ চলে যেতে হল দেখে।

১৯৩৬ – মা কমলা নেহরু মারা

নাতি রাহুলকে কোলে নিয়ে ইন্দিরা

গেলেন ইন্দিরা অকসফোরডের সমারভিল কলেজে পড়তে গেলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জের-এ সেখানেও তাঁর লেখাপড়া অর্ধসমাপ্তই রইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধল তখন ইন্দিরা সুইজারল্যানডের একটি স্যানিটোরিয়ামে। বাড়ির লোক তাঁকে দেশে ফিরে আসতে অনুরোধ জানাল। কোনক্রমে তিনি লনডনে এসে পৌছলেন। কিন্তু আর এগোনর রাস্তা নেই। অগত্যা পুরো বিশ্বযুদ্ধের সময়টাই তাঁকে কাটাতে হল লনডনেই।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, ইন্দিরা দেশে ফিরে এলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছাত্র আন্দোলনে। এরই মধ্যে ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গিয়েছে, দুজনই দুজনকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেছেন। কাজেই ১৯৪২ সালে ফিরোজ-ইন্দিরার বিয়ে হয়ে গেল। এই বিয়েতে অবশ্য প্রথমে জওহরলালের আপত্তি ছিল। কিন্তু ইন্দিরার ব্যক্তিত্বের স্রোতে জওহরলালের আপত্তি কুটোর মতই ভেসে গেল। ইন্দিরার বিয়েতেও অবশ্য রাজনীতি কম ছায়া ফেলেনি। ক্রিপস মিশনের এদেশে আসার জন্য বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। বিয়ের অল্প কয়েকদিন পরই পিতা জওহরলালকেও চলে যেতে হয়েছিল বোমবেতে। সেখানে এ আই সি সি সম্মেলনে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ হয়। খবর গিয়ে পৌছল কাশ্মীরে, নববিবাহিত দম্পতি সেখানে মধুচন্দ্রিকা যাপন করছিলেন। খবর পেয়েই তাঁদের তড়িঘড়ি ছুটে আসতে হল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে। ফলস্বরূপ বৃটিশ রাজের হাতে ইন্দিরা হলেন বন্দিনী। তের মাস তাঁকে কাটাতে হল কারাগারের অন্তরালে।

১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হল। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদটি অলংকৃত করলেন জওহরলাল। কন্যা ইন্দিরা জওহরলালের সংসার সামলানর দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন না বাইরের জগৎ থেকে। এমনকি জওহরলালের কাছে যেসব সাক্ষাৎপ্রার্থী আসতেন অনেক সময় তাঁদের সঙ্গে ইন্দিরা নিজেই কথাবার্তা বলতেন। দিনে দিনে পরিণত হয়ে উঠতে লাগলেন ইন্দিরা।

ঘরের কাজ তাঁকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি কখনও। সোশাল ওয়েলফেয়ার বোরড, চিলড্রেনস বুক ট্রাসট ও আরো নানা জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি।

চারুকলার প্রতি ইন্দিরার যেন ছিল এক প্রাণের টান। এমন কোন ভারতীয় শিল্পীর নাম বোধহয় করা যাবে না যাঁর কোন না কোন ছবি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে স্থান পায়নি। এমনকি প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে যে লোকনৃত্যের আয়োজন এখন করা হয়, জানা গেছে, তাও নাকি শ্রীমতী গান্ধীরই ভাবনার ফসল। শ্রীমতী গান্ধী নাকি অনেক ভারতীয় কবি ও সংগীতজ্ঞদের ডেকে বলেছিলেন, জাতীয় সংহতির দিকে তাকিয়ে গান রচনা করতে।

জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে ইন্দিরা তাঁর ভ্রমণসংগী হয়েছিলেন বহু দেশে। ইন্দিরাকে বিশ্ব পরিব্রাজিকা বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। যদি কেউ এমন অভিযোগও তোলেন যে, প্রখ্যাত ব্যক্তির কন্যা হবার সূত্রে ইন্দিরা তাঁর জীবনের প্রারম্ভেই লাভ করেছিলেন অনেক অযাচিত সুবিধা, তাহলে এটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া চলে যে, তা যদিও বা সত্যি হয় তাহলে পরবর্তীকালে সব ছাপিয়ে কিশোরী ইন্দিরা যে নিজের জোরেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আজ সর্বত্র। তাই তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল মাদারস অ্যাওয়ারড (১৯৫৩), ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হওলান পুরস্কার (১৯৬০), আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য ইসাবেলা ডোসটে পুরস্কার (১৯৬৫), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য মেকসিকান অ্যাকাডেমির পুরস্কার (১৯৭২), রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যানড এগরিকালচার অরগানাইজেশন-এর দ্বিতীয় বাৎসরিক পুরস্কার (১৯৭৩)। লাভ করেছিলেন 'ভারতরত্ন' উপাধি। অর্জন করেছিলেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ার পারসন হবার সৌভাগ্য। এমনকি এবছর তাঁর নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যও প্রস্তাবিত হয়েছিল।

১৯৫৫ সাল থেকে ইন্দিরা কংগ্রেস হাইকম্যানড এবং নির্বাচনী কমিটির সদস্যা ছিলেন। ১৯৫৬-য় তিনি যুব কংগ্রেস সভাপতির পদে বসলেন। ১৯৫৯-এ হলেন কংগ্রেস সভাপতি। এই পদটি এর আগে তাঁর পিতামহ মতিলাল এবং পিতা জওহরলালও অলংকৃত করে গেছেন।

১৯৬৪-তে তিনি রাজ্যসভার সদস্যাপদ লাভ করলেন। ঐ বছরই পিতা জওহরলাল মারা গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ইন্দিরার জায়গা হল। প্রথমে তাঁকে বিদেশ দফতরের ভার দিতে চাওয়া হলে তিনি তা না নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরকেই বেছে নেন।

১৯৬৬-তে লালবাহাদুরের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা মোরারজী দেশাই-এর বিরুদ্ধে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য দাবিদার করে তুললেন কিছু কংগ্রেসী নেতা। মোরারজীর পাওয়া ১৬৯ ভোটের বিরুদ্ধে ৩৬৫ ভোট পেয়ে ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হলেন। সেদিন অনেক প্রবীণ কংগ্রেসী নেতাই আহ্লাদিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, অপটু ইন্দিরাকে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়ে তাঁরা এবার রাজসুখ ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু অল্পদিনেই তাঁদের সে গুড়ে বালি পড়ল। ইন্দিরা প্রমাণ করলেন তিনি কতখানি বিচক্ষণ, কতখানি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। অল্প দিনে ইন্দিরাই হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেত্রী।

১৯৬৭-৭৭, টানা এগার বছর প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বাদ লাভ করে গেলেন তিনি। মাঝখানে অবশ্য অনেক ঝড়-ঝাপটা সামলাতে হয়েছে তাঁকে। জড়িয়ে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, জয়প্রকাশ নারায়ণের উত্তাল আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হয়েছে, পুত্র সঞ্জয়কে রাজনীতিতে আনার জন্য কঠোর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে, আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারী করতে হয়েছে।

এল ১৯৭৭ সাল। লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা পরাস্ত হলেন। কংগ্রেসের ভরাডুবি হল। একদাবন্ধুরা ইন্দিরাকে ছেড়ে গেলেন। ক্ষমতায় বসল জনতা দল।

তিনমূর্তি মার্গের জনতা শালে/ঐ ডি পার্দা থেকে

আদালতে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন ইন্দিরা। তাঁকে পাঠান হল তিহার জেলেও।

কিন্তু আবার ইন্দিরা প্রমাণ করলেন রাজনৈতিক ক্ষুরবুদ্ধিতে তাঁর ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষতে পারেন না। ১৯৮০-র নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলেন, কংগ্রেসকে করলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। সুখের পায়রারা আবার উড়ে এল তাঁর কাছে। ঐ ১৯৮০তেই আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল তাঁর জীবনে। বিমান দুর্ঘটনায় পুত্র সঞ্জয়ের মৃত্যু হল।

ক্ষমতায় এসে এবারও ইন্দিরাকে সামাল দিতে হয়েছে অনেক দিক। পাঞ্জাব সমস্যা, আসাম সমস্যা সামলাতে হয়েছে। বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে হয়েছে। বিদেশি হুমকির প্রত্যুত্তর দিতে হয়েছে। অবশ্য এরই মধ্যে তাঁর আরেক পুত্র রাজীবও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন।

আর তারপর এই ১৯৮৪। লোকসভা নির্বাচন যখন প্রায় ভারতীয় রানীতির দরজায় ঘা মারছে ঠিক সেই সময়ই চক্রান্তকারীদের ঘৃণ্য চক্রান্ত ছিনিয়ে নিল ভারতীয় রাজনীতির এক কিংবদন্তীর চরিত্রকে। অনেকে বলতেন, ইন্দিরা সবসময় চমক দিতে পছন্দ করেন। শেষ চমকটা বোধহয় ইন্দিরা নিজের জীবন দিয়েই দিয়ে গেলেন। □

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কেশ চিকিৎসার ইতিহাসে এক নবীনতম আবিষ্কার!

কেয়ো-কার্পিন

হেয়ার ভাইটালাইজার*

যাদের মাথার চুল বেশী মাত্রায় পড়ে, খুস্কি জমে, তাদের জন্যই তৈরী এই বিশেষ হেয়ার ভাইটালাইজার !

অনেক বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শেষ পর্যন্ত চুলপড়া বন্ধের সঠিক উপাদানগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।
দে'জ সেই উপাদানগুলি দিয়েই তৈরী তাদের নতুন কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার আপনাদের কাছে নিয়ে এলো।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার তিন ভাবে কাজ করে ঃ

● চুল পড়া বন্ধ করে ● নতুন চুল জন্মাতে সাহায্য করে ● খুস্কি দূর করে

চুল পড়া ও খুস্কির সমস্যা দূর করতে দিনে রাত্রে দুবার কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার ব্যবহার করুন।

...আর চুলের জৌলুস বাড়াতে রোজ ব্যবহার করুন কেয়ো-কার্পিন কেশ তেল!

দে'জ এর উৎকৃষ্ট অবদান Dey's

* This is not a toilet preparation.

PX/KHV/B-2/83

কেউ বলত স্বৈরতন্ত্রী, কেউ বলত তিনি দেশকে শক্ত বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন

১৯৮০ সালে তাঁর দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের পর ইন্দিরা দেশকে এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করে চলেছিলেন। কিন্তু সময়টা যেমন ছিল সবচেয়ে অনুকূল, তেমনি সবচেয়ে প্রতিকূলও।

১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হবার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, ভারতবর্ষের বুকে বুঝি চিরদিনের জন্য কংগ্রেসের কবর খোঁড়া হল। বিদগ্ধ মহল থেকে এমন ধারণাও পোষণ করা হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রীর আসনে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে ফিরে আসা আর সম্ভব হবে না, তার কারণ জনতা সরকারের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ অভাবনীয় সমর্থন। ফলে দলে দলে কংগ্রেসের অতি সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে অনেক নামীদামী নেতাও রাতারাতি খোলস বদলে ঢুকে পড়েছিলেন কংগ্রেস-বিরোধী শিবিরে। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা একসময়ে ইন্দিরা গান্ধীর অতি বিশ্বস্ত জন হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু সমস্ত ছবিটাই আচমকা বদলে গেল ১৯৮০ সালে। ঐ বছর ৩ – ৬ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সেই বহু-আলোচিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই আবার ক্ষমতায় ফিরে এলেন এবং এলেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে।

ইন্দিরা যে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে চলেছেন, তার আভাস কিন্তু বোঝা গিয়েছিল ১৯৭৮ সাল থেকেই। জনতা সরকারে আসীন মন্ত্রিসভা বনাম প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠতে দেরি হয়নি। দেরি হয়নি সমঝোতার আলগা বাঁধনে বাঁধা সরকারে ভাঙন শুরু হতে। এবং তারই পরিণতি হিসেবে একসময় সরে যেতে হয়েছে মোরারজী দেশাইকে, প্রধানমন্ত্রীর আসনে অল্পদিনের জন্য হলেও বসেছেন চরণ সিং। বলাই বাহুল্য এসবই ছিল ক্ষণস্থায়ী পরিস্থিতি মাত্র। ফলে ১৯৮০ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী আবার ফিরে এলেন শুধুমাত্র একটি শ্লোগানের জোরে – স্থায়ী সরকার গঠন করতে কংগ্রেস (ই)-কে ভোট দিন।

জনসাধারণও তখন বিভ্রান্ত অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছেন। বুঝতে পেরেছেন ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করে জনতা দলকে সরকারে প্রতিষ্ঠিত করে, কী চরম ভুল তাঁরা করেছেন এবং সেই ভুলের মাশুলও দিতে হয়েছে কতখানি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষণস্থায়ীত্ব যে জনগণের স্বার্থের পক্ষে কতখানি ভয়ংকর হতে পারে, তার প্রমাণও তাঁরা পেয়েছেন ইতোমধ্যেই। তাছাড়া একথা অনস্বীকার্য, ইন্দিরা গান্ধী প্রশাসক হিসেবে যতখানি যোগ্য ছিলেন, অন্য কোন প্রশাসকই সে যোগ্যতার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেননি। পুরনো সেই অভিজ্ঞতা, পাশাপাশি ইন্দিরা গান্ধী প্রবর্তিত ২০-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচির ঘোষণা – সবকিছুই সমানভাবে কাজ করল জনগণের মনে। ১৯৮০ সালের শুরুতেই তাই ক্ষমতায় ফিরে আসতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হল না ইন্দিরাকে।

তারপর থেকে সবটুকুই শুধু উন্নতির ইতিহাস। ভারতবর্ষের সর্বস্তরের সমাজের মানুষের মধ্যে ইন্দিরা তখন 'ভারতমাতা', কেউ কেউ বা একটু বাড়িয়ে তাঁকে করে তুললেন 'জগজ্জননী'।

লোকসভার ৫২৫টি আসনের ৩৫১টিই তখন কংগ্রেস (ই)-এর দখলে। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে যে জনতা দল ২৯৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল, এবারের নির্বাচনে তারা পেল মাত্র

৩১টি আসন। জনতা সরকারের ভাঙনের মূল লোকদল তুলনামূলকভাবে একটি বেশি আসনেই জয়ী হল। তারা পেল ৪১টি আসন, অন্যদিকে কংগ্রেস (ইউ)-এর দখলে এল মাত্র ১৩টি আসন।

১৯৭৭ সালে জনতা দলের জয়লাভের মূলে ছিল ইন্দিরা প্রবর্তিত ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থা। বিরোধী নেতৃবর্গ জনসাধারণের মনে একটা ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, ইন্দিরা সরকার জরুরী অবস্থার প্রবর্তন করে সারা ভারতের জনগণের ওপর ফ্যাসিসট শক্তি চাপাতে চাইছেন জোর করে। নাসবন্দী প্রথার মাধ্যমে যৌন-পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে শতশত নারী-পুরুষকে তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিন্দুমাত্র স্বীকার না করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এমনকি মানুষের মৌলিক অধিকারকেও সংকুচিত করে তোলা হচ্ছে আইনের অনুশাসনের ভয় দেখিয়ে।

এতসব প্রচার চালিয়ে সরকারে প্রতিষ্ঠা পাবার পরও কিন্তু খুঁটি আঁকড়ে থাকতে পারেনি জনতা সরকার। পরবর্তী দিনগুলোর প্রতোকটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ – রাজায় রাজায় যুদ্ধে প্রাণ বিপন্ন হয়েছে সাধারণ ভারতবাসীর। ফলে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হয়ে ইন্দিরা গান্ধী পূর্বতন প্রশাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে মনোযোগ দিলেন এমন একটি সরকার এবং প্রশাসন গড়ে তুলতে যা মূলত জনগণের সহায়ক। যা প্রধানত জনগণের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় রত থাকবে।

পূর্বতন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধী বুঝেছিলেন, সরকারকে জনগণের আস্থাভাজন করে তুলতে হলে প্রথমেই দরকার একটি স্থায়ী সরকার – যেখানে বিভেদের শিকড় পরিব্যাপ্ত হবার সুযোগ থাকবে না। পাশাপাশি প্রয়োজন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর পুনর্বিন্যাস এবং বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যা ভারতবর্ষকে সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম গণতান্ত্রিক উন্নয়নকামী শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

করেছেনও তাই। ১৯৮০ সালের পর থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। তাঁর দুঃসময়ের দিনে এককালের যে সমস্ত স্বজনরা শত্রু হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের সরিয়ে দিয়েছেন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে। তার কারণ, ঐ সমস্ত 'গৃহশত্রু'রাই ছিলেন ১৯৭৭-এর নির্বাচনে ইন্দিরার পরাজয়ের অন্যতম কারণ। ফলে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ২২ সদস্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছিলেন অনেক নতুন মুখ, যাঁদের ১৫ জন এসেছিলেন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে, বাকি ৭ জন ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী। নতুন হিসেবে সে সময় দেখা গিয়েছিল ভেঙ্কটরমণ, জৈল সিং, বসন্ত শাঠে, রাও বীরেন্দ্র সিং, এ বি গণি খান চৌধুরী, ভীষ্মনারায়ণ সিং,

শিবশঙ্কর, পি ভি নরসীমা রাও প্রমুখকে। পুরনোদের মধ্যে ছিলেন এ পি শর্মা, শঙ্করানন্দ, পি সি শেঠী, জে বি পট্টনায়ক এবং প্রণব মুখারজি। এইভাবে নতুন এবং পুরনো সদস্য মিলিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইন্দিরার নিজের হাতকে শক্তিশালী করে তোলা। প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনের পরও আরও বেশ কয়েকবার মন্ত্রিসভার রদবদল ঘটেছে। রদবদল ঘটেছে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতেও। উদ্দেশ্য সেই একই – কোন দপ্তরে দীর্ঘদিন কাজ করার অজুহাতে

কাউকে একক ক্ষমতার অধিকারী হতে না দেওয়া।

ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভা নিয়ে এই 'খেলা'কে কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিরোধী মন্তব্যের ঝড় বয়ে গেছে সময়ে অসময়ে। কিন্তু প্রতিবাদের ঝড়কে উপেক্ষা করে ১৯৮০ সালের ১৫ জুন আরও নতুন মুখ দেখা গেছে মন্ত্রিসভায়। ঐ বছরই ২৫ অকটোবর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন কমলাপতি ত্রিপাঠি এবং শোনা গিয়েছিল তাঁর পদত্যাগের অন্যতম কারণই ছিল, রেলমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর সন্তোষমত কাজ করতে সক্ষম না হওয়া। ১৯৮১-র মারচে একই অবস্থা ঘটল তৎকালীন অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লার কপালেও, ১৯৮১-রই ৮ আগসট আবার দপ্তর পুনর্বিন্যাস করা হল, পরিকল্পনা মন্ত্রী এন ডি তেওয়ারি বসলেন শিল্পমন্ত্রীর আসনে এবং তাঁর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন শিক্ষামন্ত্রী এস বি চাবন।

ঠিক এইভাবেই পর পর মন্ত্রিসভায় বদল ঘটেছে ১৯৮২-র ২ সেপটেমবর, ১৯৮৩-র ২৯ জানুয়ারি এবং ১৪ ফেবরুয়ারি, এমনকি ১৯৮৪-তেও। অনেকে সরে গেছেন নির্দ্বিধায়, অনেকে ফিরে এসেছেন গুরুত্বপূর্ণ পদে। কেউ কেউ দোহাই দিয়েছেন, তাঁরা দলের বৃহত্তর স্বার্থে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন স্বইচ্ছায়। স্বইচ্ছায় হোক অথবা ইন্দিরার ব্যক্তিগত ইচ্ছাতেই হোক, ঘটনা হল, ইন্দিরা গান্ধী স্থায়ী সরকার গঠনে মনোযোগ দিতে সরকারে বদল ঘটিয়েছেন যখন খুশি তখনই। এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, এর প্রয়োজনীয়তাও ছিল অসীম। তাছাড়া এই রদবদলের মধ্যে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী একথাও প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতাপ অসীম, অম্লান, কোন শক্তিরই ক্ষমতা নেই, তাঁর সেই শক্তিকে পদদলিত করে।

১৯৮১ সালে লোকদলের নেতা জরজ ফারনানডেজ ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন লোকসভায়। অভিযোগ, দেশের সার্বিক উন্নয়নে ইন্দিরা সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সে অভিযোগ আদৌ ধোপে টিকল না, ৯ মে তারিখে লোকসভায় সেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। ঠিক একইভাবে ১৯৮১-র ৩ সেপটেমবর এবং ১৯৮২-র ১৬ আগসট আনীত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনাস্থা প্রস্তাবও বিপুল ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে গেল লোকসভার চার দেওয়ালের মধ্যে। ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় জোর গলায় ঘোষণা করলেন, বিরোধী সদস্যরা ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাঁর সরকারকে জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছেন এবং দেশের সুনামকে ক্ষুণ্ণ করে দেশের বিপদ ডেকে আনছেন।

শুধু কেন্দ্রীয় সরকারেই নয়, ইন্দিরা গান্ধী

হস্ত বাড়িয়েছিলেন বিরোধী দল পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির ওপরেও। তিনি বুঝেছিলেন, দেশের মধ্যে সর্বত্র তাঁর ভাবমূর্তি এবং শাসনক্ষমতাকে অব্যাহত রাখতে হলে বিরোধী দলগুলির পতন ঘটান অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া ভারতের সর্বত্র একই প্রশাসন ব্যবস্থা চালু না করতে পারলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিপদ ঘনিয়ে আসতেও বিশেষ দেরি হবে না। ফলে ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক রাজনৈতিক ঘনঘটার মধ্যে পতন ঘটল বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশ সরকারের। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সমস্ত রাজ্যগুলির অধিকাংশ ছিল জনতা বা বিরোধী দলগুলির জোট পরিচালিত সরকারের শাসনাধীন। এবং অস্বাভাবিকভাবে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে ৮টি রাজ্যে কংগ্রেস (ই) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ফিরে এল শাসন ক্ষমতায়। স্বীকার করতে বাধা নেই, এই উল্লেখযোগ্য ফলাফলের মূলে ছিল ইন্দিরা গান্ধীর প্রশাসক হিসেবে অম্লান ভাবমূর্তি।

রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনেও ইন্দিরার প্রভাব পড়ল যথেষ্ট। অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই নতুন করে ফিরে এলেন নিজ নিজ রাজ্যপ্রধানের আসনে। কোন কোন জায়গায় নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে বসান হল কেন্দ্রীয় সরকারের পছন্দমত ব্যক্তিকে। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের টি অনজাইয়া, বি ভি রেড্ডি এবং কে বিজয় ভাস্কর রাও, মহারাষ্ট্রের বাবাসাহেব ভোসলে এবং বসন্তদাদা রাও পাতিল, হিমাচল প্রদেশের বীরভদ্র প্রমুখ।

কিন্তু এত সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে কংগ্রেস (ই) অনেক রাজ্যেই প্রাধান্য হারাতে শুরু করল ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে। ঐ বছর হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা এবং পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা যে কমছে, তার প্রমাণ মিলল হাতেনাতে। কেরালা এবং পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী দলের প্রাধান্য আগে থেকেই ছিল, কিন্তু চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল হিমাচল প্রদেশ এবং হরিয়ানার ফলাফল। কংগ্রেসের প্রাধান্যবেষ্টিত এই দুই রাজ্যে বিরোধী দলগুলি কংগ্রেস (ই)-এর থেকে অনেক ভাল ফলাফল করল।

একইভাবে ১৯৮৩-র বিধানসভা নির্বাচনে বিরূপ ফলাফল মিলল দক্ষিণ ভারতে। ইন্দিরা গান্ধী দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে বরাবরই ভাল ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু নির্বাচনে দেখা গেল অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম বিপুল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কর্ণাটকেও জনতা দলের নিরবচ্ছিন্ন প্রতাপ রয়ে গেল। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেল আসাম এবং পাঞ্জাবে। আসামের দাঙ্গাকে দীর্ঘস্থায়ীরূপে দানা বাঁধতে না দিলেও, ইন্দিরা গান্ধী চরম ভুল করলেন সেখানে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করলেও হাঙ্গামার পরিসমাপ্তি ঘটল না। আসাম এবং পাঞ্জাব দুই রাজ্যেই রক্তের বন্যা বয়ে গেল দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে সামরিক বাহিনীর তৎপরতায় সেই হাঙ্গামার সাময়িক বিরতি ঘটান সম্ভব হল বটে, কিন্তু চরম সমালোচনার শিকার হয়ে পড়লেন ইন্দিরা গান্ধী। একথা অনস্বীকার্য, এ ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অনুরূপ পরিস্থিতিতে যত প্রয়োজনীয় বা কার্যকরীই হোক না কেন, জনসাধারণের একাংশের মনেও একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠছেন। এরকম ধারণা আরও গভীরভাবে রেখাপাত করল সিকিম, জম্মু ও কাশ্মীর এবং অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য সরকারগুলির পতন ঘটানর পরিপ্রেক্ষিতে। লোকসভা নির্বাচন হবে কি হবে না এ সম্বন্ধেও সমাজের সর্বস্তরে একটা জোর আলোচনা উঠেছিল। বহু বিদগ্ধ রাজনৈতিক মহলই ধারণা করে নিয়েছিল যে লোকসভা নির্বাচন আদৌ হবে না, কারণ ইন্দিরা গান্ধী চাইছেন, সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করতে। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হত, সে কথা হয়ত চিরদিনের জন্যই অজানা থেকে গেল। তবে একথা তো মানতেই হবে, ইন্দিরা গান্ধীর পরিকল্পনা যেমনই হোক, তা জাতির স্বার্থ বিপন্নের কারণ হয়ে উঠত না কখনই, কারণ অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে ভারতবর্ষের মাটিতে একজন রাজনীতিবিদই ছিলেন – তিনি ইন্দিরা গান্ধী।

শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দাবিদার হিসেবেও ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন অসামান্যা। কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকেই তিনি সবিশেষ চেষ্টা করে গেছেন দেশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলতে। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা যখন ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। সে সময়ের ২৭.৫ শতাংশ বাৎসরিক মূল্যবৃদ্ধির হারের জন্য বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি পূর্বতন চরণ সিং সরকারকে দোষারোপ করে বলেছিলেন – ১৯৭৯-৮০ সালের অনভিপ্রেত রাষ্ট্রীয় বাজেটই এই মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

মূল্যবৃদ্ধির এই ঊর্ধ্বমুখী গতিকে স্থির পর্যায়ে আনতে ইন্দিরা সরকার ১৯৮০ সালের শেষ সময় থেকেই তৎপর হয়ে উঠল। সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির হার নেমে দাঁড়াল ১৮.৫ শতাংশে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এ কথাও জানা গেল যে, দেশের সর্বত্র একটা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বাড়ল ৪ শতাংশ, কৃষিক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ। ব্যাংকের সুদও বেড়ে গেল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। জাতীয় আয়ের পরিমাণ শতকরা ৭ শতাংশ বেড়ে গেল মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে। ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচির সার্বিক রূপায়ণে সাড়া জাগল পৃথিবী জুড়ে।

একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বনিয়াদ যেমন ধীরে ধীরে উন্নতির পথে পা বাড়াচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনই বিদেশ নীতির সার্বিক রূপবদলের চিহ্ন দেখা গেল ভারতবর্ষের বুকে। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনার প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। একমাত্র কিছুটা স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছিল জনতা সরকারের আমলে। ইন্দিরা ক্ষমতায় আসীন হবার পর সেই পুরনো বৈশিষ্ট্যই নতুন রূপে ফিরে এল। চীন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্ভাব গড়ে তোলার পক্ষে পরিকল্পিত নীতি গৃহীত হল। বারবার আলোচনায় বসা থেকে শুরু করে, দ্বিপাক্ষিক প্রস্তাব গ্রহণ – সর্বক্ষেত্রেই ইন্দিরা গান্ধীর বাস্তব নীতির রূপায়ণ চোখে পড়ল। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত সফর করেও ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীব্যাপী ভারতের সুমহান ঐতিহ্য এবং গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতার বাণী প্রচার করে বেড়ালেন বার বার। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, এমনকি অন্যান্য ছোটখাট বহু রাজ্যেও ইন্দিরার এই সফর ঝড় তুলল। ইন্দিরার ভাবমূর্তি আরও ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ল দেশে বিদেশে। বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, কমনওয়েলথ সম্মেলন, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে এবং ভারতের বুকে আন্তর্জাতিক মানের খেলার আসর বসিয়ে ইন্দিরা দেশে বিদেশে দূরদর্শী রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে সুনাম অর্জন করলেন। তাছাড়া মহাকাশ গবেষণা এবং উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশের বহু রাষ্ট্রের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং আস্থা অর্জনও ভারতকে এগিয়ে দিল বেশ কয়েক ধাপ।

আজ ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা এখনই বলা শক্ত। ঠিক যে সময়েই ভারত ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ধীরে ধীরে সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছিল উন্নয়নের পথ বেয়ে, ঠিক তখনই বিদায় নিতে হল তাঁকে। এখন শুধু দেখে যাওয়ার পালা নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের নতুন যুগের সূচনা কেমন হয়। □

সুজিত রায়

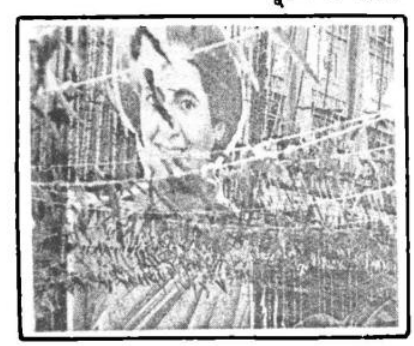

আপনার সজাগ
দেহরক্ষীকে চিনুন
Godrej
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
Godrej
CINTHOL
সিন্থল …৩০ বছরেরও বেশীকাল ঘরে-ঘরে বিশ্বস্ত নাম—
সারা পরিবারের সবারই প্রিয় সাবান, যা ত্বকের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী
জীবাণু নাশে অদ্বিতীয়।
এটি আপনার শরীরকে দুর্গন্ধ মুক্ত করে, আপনাকে সারাদিন
তরতাজা রাখে।
এটি শুধু করে না পরিস্কার … আপনাকে রাখেও চমৎকার।
গোদরেজ
সিন্থল – দুর্গন্ধনাশক সাবান
CHAITRA-B-G-189-BEN
যে দেহরক্ষীর প্রহরার…
সবার অঙ্গেই দরকার!

পাঞ্জাবই ছিল শ্রীমতী গান্ধীর সবচেয়ে কঠিন সমস্যা

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে রাজনীতির পণ্ডিতপ্রবররা বলতেন : এই ভদ্রমহিলাকে চেনা যায় তাঁর সংকটের সময়।

সত্যি কথা। ওঁর জীবনে যতই একের পর এক অগ্নিপরীক্ষা এসেছে, ততই বেশি করে প্রমাণিত হয়েছে ওঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, অকুতোভয় মনোভাব আর সর্বোপরি সমস্যা সমাধান করার আশ্চর্য ক্ষমতা। আর একথাও ঠিক, ইতিহাস যদি কখনও প্রশ্ন তোলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধীকে সবচেয়ে কঠিন কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তবে সে প্রশ্নের অবিসংবাদী উত্তর হবে : পাঞ্জাব। এমনকি এই পাঞ্জাব সমস্যা যে বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেই বিষই যে ভেতরে ভেতরে নিষিক্ত করেছে ইন্দিরা হত্যার ষড়যন্ত্রকে, এমন একটা সম্ভাবনার কথা অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও।

পাঞ্জাবের সমস্যা আসলে কী? কেনই বা শস্য শ্যামলা পঞ্চনদের এই সবুজ দেশে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল রোষ আর প্রতিহিংসার আগুন? সে প্রশ্নের মূল নিহিত হয়ে আছে বহু গভীরে। তবে ইদানীং কালে যে সব ঘটনার দরুন সন্ত্রাসবাদীরা আজ ইন্দিরা গান্ধীর প্রাণনাশে লিপ্ত হয়েছে, সে ঘটনার শুরু হয়েছে বলা চলে ১৯৮০ তে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় ফিরে আসার পরই।

১৯৭৮ এ শিখ নিরংকরী সংঘর্ষ এবং নিরংকরী প্রধান বাবা গুরবচন সিং দিললিতে মারা যাবার পর পাঞ্জাবে বহু হিন্দু ও নিরংকরীকে প্রাণ হারাতে হয় শিখদের হাতে। এই সময় লালা জগতনারায়ণের হত্যার অভিযোগে সরকার ভিনদ্রানওয়ালেকে গ্রেফতার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরই ভিনদ্রানওয়ালে রাতারাতি উগ্রপন্থী দলের নেতা হিসেবে দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দল খালসা, অখন্ড কির্তনী জাঠ ও ন্যাশনাল কাউনসিল অব খালিস্তান নামে নানান দল গজিয়ে ওঠে। এরা আশ্রয় নেয় অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। ভিনদ্রানওয়ালের দুই সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হলে এরা সবাই একযোগে দাবি জানায় তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির। এবং অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির প্রাংগণ থেকে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানায়। পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের এই তৎপরতাকে রাজনৈতিক ফায়দা হিসেবে কাজে লাগাতে এগিয়ে আসেন অকালি দল (লংগোয়াল)। অকালি দল এই উগ্রপন্থীদের দাবির সংগে মিশাল দেন আনন্দপুর সাহিবে বানচাল করা বেশ কিছু দাবি-দাওয়া। বারবার সরকারপক্ষের সংগে আলোচনা ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে ভিনদ্রানওয়ালের উগ্রপন্থীরা লুঠতরাজ, খুন-খারাবি নির্বিচারে চালাতে থাকে। এবং হিংসা আর উন্মত্ততাকে কেন্দ্র করেই বিরোধ বাঁধে ভিনদ্রানওয়ালের চরমপন্থীদের সংগে লংগোয়ালের অকালি দলের।

এই ত্রিশংকু অবস্থা সামলাতে ইন্দিরা গান্ধীকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হয়। ঘটতে থাকে পাঞ্জাবে একের পর এক অঘটন।

● ১৯৮৩-র ৬ অকটোবর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় পাঞ্জাবে।

● ১৯৮৪-র ১৯ মারচ অল ইনডিয়া শিখ স্টুডেনটস ফেডারেশনকে সরকার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। ওই দিনই রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ান হল।

● ২০ মারচ এ আই এস এস এফ অকালি দলের প্রেসিডেনট সন্ত হরচাঁদ সিং লংগোয়ালের বিরুদ্ধে মামলা করলেন এবং ওঁকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে মোরচা থেকে বহিষ্কার করলেন।

● ১৯৮৪-র ২৮ মারচ দিললির গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির প্রধান হরবনস সিং মানচানডাকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাতে হল।

● ৩১ মারচ সরকার অকালি দলের দাবি অনুযায়ী সংবিধানের ২৫ ধারা সংশোধন করতে রাজি হলেন। লংগোয়াল তাঁদের প্রস্তাবিত 'পন্থ আজাদ সপ্তাহ' নামে যে বিক্ষোভ শুরু করার কথা ছিল তা আপাতত বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উগ্রপন্থীরা একেবারে মরীয়া হয়ে উঠল। তারা ব্যাপক হানাহানি শুরু করল। ৩ এপরিল কংগ্রেস (ই)-র রাজ্যসভার সদস্য ডঃ ভি এন তিওয়ারিকে উগ্রপন্থীরা হত্যা করল।

● ১৪ এপরিল ভিনদ্রানওয়ালের একজন উগ্র সমর্থক, সুরিন্দর সিং সোধিকে অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের সামনে এক হোটেলে গুলি করে হত্যা করা হল। এই হত্যাকে কেন্দ্র করে ভিনদ্রানওয়ালে-লংগোয়াল বিরোধ চরমে উঠল।

● ১ মে, সরকার দল খালসা ও ন্যাশনাল কাউনসিল অব খালিস্তানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

● ২ মে কংগ্রেস (ই)-র একজন এম এল এ লাথা সিংকে উগ্রপন্থীরা অমৃতসরে হত্যা করল।

● ১২ মে উগ্রপন্থীরা জলন্ধরের হিন্দ সমাচার সংবাদপত্রের সম্পাদক রমেশ চন্দ্রকে হত্যা করল।

● ১৬ মে ওয়েসটারন কমানডের লেফটন্যানট জেনারেল আর এস দয়াল পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজ্যপাল বি ডি পানডের সংগে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন।

● ৩০ মে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি জৈল সিং পাঞ্জাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বসলেন।

● ২ জুন সারা দেশব্যাপী এক বেতার ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী অকালি দলকে অনুরোধ জানালেন তাদের বিক্ষোভ ও অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ রাখতে।

ঐ দিনই পাঞ্জাব ও চন্ডীগড়ে আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা দৃঢ় করতে সৈন্য নামান হল। ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন 'সরকার হিংসার কাছে নতি স্বীকার করবে না।'

● ৩ জুন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা বারবার স্বর্ণমন্দিরের বাইরে থেকে ঘোষণা করলেন উগ্রপন্থীদের বেরিয়ে আসার জন্য। উত্তর পেলেন এক ঝাঁক গুলি। বাধ্য হয়ে তাঁরা একে একে মন্দির প্রাংগণে ঢুকে পড়লেন।

● পাঞ্জাবে সংবাদপত্রগুলির ও অন্যান্য মিডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। ৬ জুন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা উগ্রপন্থীদের হটিয়ে দিয়ে পুরোপুরি স্বর্ণমন্দির নিজেদের আয়ত্তে আনলেন। অকাল তখতে বেশ চোট লাগল। ভিনদ্রানওয়ালে ও তাঁর সহযোগীদের সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া গেল না।

● ৮ জুন ভিনদ্রানওয়ালে ও তাঁর দুই সহযোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হল।

● ২২ জুন স্বর্ণমন্দির পরিদর্শনে যান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। রাষ্ট্রপতি জৈল সিং ও কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এর আগেই সেখানে ঘুরে আসেন।

● ২৮ জুন পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজ্যপাল বি ডি পানডে ও পুলিশবাহিনীর আই জি পি এস ভিন্দার পদত্যাগ করেন।

● ১০ জুলাই সরকারের তরফ থেকে পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর ওপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়। ১৭০ পাতার এই শ্বেতপত্রে বিদেশি অশুভ শক্তির পুরোচনার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়।

● ১২ জুলাই ইন্দিরা গান্ধী অকালি দলের দাবি অনুযায়ী স্বর্ণমন্দির থেকে নিরাপত্তা বাহিনী সরানর কথা নাকচ করে দেন।

● ১৬ জুলাই স্বর্ণমন্দির চত্বর নিরাপত্তা বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য অকালি দল অমৃতসরে 'শহিদি জাঠা' পাঠানর সিদ্ধান্ত নেন।

● ২৫ জুলাই শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেন স্বর্ণমন্দির প্রাংগণ আবার আগের অবস্থায় না আসা পর্যন্ত সেনাবাহিনী সরান অসম্ভব।

● ২৬ জুলাই থেকে অকাল তখত সারানর কাজ 'কর সেবা' শুরু হয়।

● ২৯ সেপটেমবর সরকার স্বর্ণমন্দির থেকে সৈন্য তুলে নিলেন এবং পাঁচ শিখ পুরোহিতের হাতে মন্দিরের ভার অর্পণ করলেন।

এরপরও স্বর্ণমন্দির বা পাঞ্জাবে ভালয়-মন্দয় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে বলা যেতে পারে ২৯ সেপটেমবরই সমগ্র দেশের যাবতীয় টেনসনের নিষ্পত্তি ঘটল। ইন্দিরা গান্ধী আরও একবার প্রমাণ করলেন সমস্যা কীভাবে সমাধান করতে হয়। কিন্তু আসল সমস্যা কি তাতে মিটল? মিটল যে না তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন শ্রীমতী গান্ধীকে প্রাণ হারাতে হল আততায়ীর গুলিতে। তিনি ২ জুন যে ঘোষণা করেছিলেন 'সরকার কোন হিংসার কাছে নতি স্বীকার করবে না', তা সত্যি হয়েও কেমন মিথ্যে হয়ে গেল। সেই হিংসার কাছে সরকারকে নতি স্বীকার করতে দিলেন না ঠিকই, নতি স্বীকার করল ভারতরত্নের প্রাণ। □

দিব্যজ্যোতি বসু

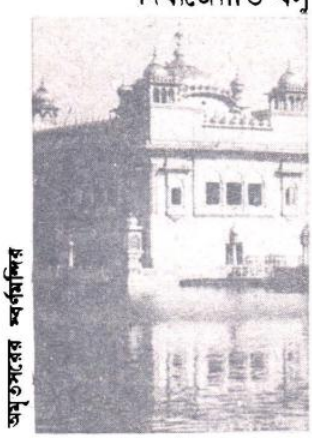

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির

শ্রীমতী গান্ধী পাঞ্জাব নিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন

প্রখ্যাত সাংবাদিক খুশবন্ত সিং সম্প্রতি নয়া দিললিতে এ কে ফিচারস সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর কথায়, শ্রীমতী গান্ধী যেভাবে পাঞ্জাব সমস্যার মোকাবেলা করতে গিয়েছেন তাতে শ্রীমতী গান্ধীরই বিপদ আরো কাছে এসে গিয়েছে। এছাড়াও আরো নানা বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। সেই সাক্ষাৎকারটি এখানে দেওয়া হল।

প্রশ্ন : এই দেশটা ভেঙে টুকরো টুকরো হতে চলেছে কিনা, এরকম একটা প্রশ্ন দিয়ে যদি আমরা শুরু করি তাহলে কেমন হয়?

খুশবন্ত : এটা কি আমরা আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি না? যেসব বিষয়ের ওপর গণতন্ত্র নির্ভর করে, অর্থাৎ পরিষদীয় ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র আর বিচারব্যবস্থা – এখন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রশ্ন : এর জন্য কে অথবা কারা দায়ী বলে আপনি মনে করেন?

খুশবন্ত : হ্যাঁ, আমি বলব এর জন্য দায়ী শ্রীমতী গান্ধী। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে তিনি এমন কিছু লোককে সংসদে এনেছেন যাঁদের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞান নেই।

প্রশ্ন : প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কী মূল্যায়ন আপনি করেন?

খুশবন্ত : তাঁর কার্যকলাপে আমি, খুব হতাশ হয়েছি। বিশেষ করে বিগত সাড়ে চার বছরে তাঁর কাজকর্মে। তিনি তাঁর নীতিগুলি সম্পর্কে কখনই দৃঢ়সংকল্প থাকতে পারেননি। বরং এসবের থেকে তিনি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন করে নিজের ইমেজ বাড়ানর দিকেই বেশি করে ঝুঁকেছেন। এছাড়া তিনি পারিবারিক শাসনক্ষমতা কায়েম করতে চলেছেন, এ অভিযোগও আনা যায়।

প্রশ্ন : রাজীব গান্ধী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

খুশবন্ত : আমি তাঁকে খুব সামান্যই জানি, কিন্তু আমার মনে হয় উনি নিজের পথে এগিয়ে চলেছেন। অবশ্যই তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা কিনা জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য। এছাড়া এরকম দেশ, যেখানে পারিবারিক শাসনকে খারাপ কিছু বলে মনে করা হয় না, সেখানে তিনি গ্রহণীয় হয়ে উঠবেন এরকম একটা সুযোগও থেকে যাচ্ছে। কিন্তু নীতিগত দিক দিয়ে দেখলে বলতে হবে, দীর্ঘদিন ধরে এরকম চললে তা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন : এবার পাঞ্জাব প্রসঙ্গে আসা যাক। আপনি কি মনে করেন পাঞ্জাবে সেনাবাহিনী পাঠান এবং সেখানে সৈনাবাহিনীর কার্যকলাপ এটাই ইঙ্গিত করছে যে কেন্দ্র ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে? এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কী হবে বলে আপনি মনে করেন?

খুশবন্ত : অসামরিক প্রশাসনের কাজ সামরিক বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিলে তার পরিণাম কতখানি ক্ষতিকর হতে পারে তা আমরা আগে অন্যান্য কয়েকটি দেশের বেলায় দেখেছি। গত কয়েক মাসে সেই একই ব্যাপার আমরা এখানে ঘটতে দেখলাম। গত পাঁচ বছরে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আধা-সামরিক বাহিনীগুলির শক্তি অন্তত পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মত অন্যান্য ব্যাপারে যখন অসামরিক প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে তখনই সেই কাজে সামরিক এবং আধা-সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করা একটা রুটিন-মাফিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের নীতির প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা তো এখন স্পষ্ট। সেনাবাহিনীর কাজ হচ্ছে দেশের সীমান্তরেখাকে রক্ষা করা। কিন্তু যখনই গোটা সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সেনাবাহিনীও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে আমি একটা যথাযথ উদাহরণ দিতে পারি। সেনাবাহিনীর ক্যানটিনে যেসব 'রাম' কম দামে দেওয়া হয় তাই পাঞ্জাবে সেনাবাহিনীর বেশ কিছু জওয়ান চোরাপথে বিক্রি করেছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন পাঞ্জাবে জনসাধারণের ভেতর সৈনাবাহিনীর প্রতি একটা সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব দেখা যাচ্ছে?

খুশবন্ত : পাঞ্জাবের জনসাধারণ ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে মনে করছে। এর আগে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষের সময় পাঞ্জাবের গ্রামের মানুষেরা সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দুধ আর খাবার যোগান দিয়েছে। আর এখন? আমি এমন অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে জওয়ানদের এক গ্লাস জল দিতে পর্যন্ত সাধারণ মানুষ অস্বীকার করেছে। পরে যদি আবার কোন যুদ্ধ বাধে তখন যে কী হবে তা কেউ বলতে পারে না।

এর আগেও আমি অন্যান্য সাক্ষাৎকারে বলেছি, অপারেশন ব্লু-স্টারের আগে পাঞ্জাবে উগ্রপন্থীদের পায়ের নিচে যে জমি ছিল এখন তা আরো শক্ত হয়ে গেছে। কারণ আর কিছুই নয়। তারা ক্ষুব্ধ শিখ সমাজের স্পর্শকাতর মনকে কাজে লাগাতে পেরেছে। তাদের শ্লোগান – কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুদের সরকার – এখন বহু শিখের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয়, যেভাবে প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সেনাবাহিনীকে ডাকা হচ্ছে তাতে সেনাবাহিনীর মানসিকতা-নৈতিকতা নষ্ট হতে বসেছে?

খুশবন্ত : নিশ্চয়ই। সেনাবাহিনীর অনেকে এই ব্যাপারে কঠোর প্রতিবাদও জানিয়েছেন। এই বিষয়ে সেনাবাহিনীর অনেক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল সুস্পষ্ট এবং কঠোরভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর আমার ব্যক্তিগত মতামত হল, অপারেশন ব্লু-স্টারের মত কোন অপারেশন যে জেনারেল পরিচালনা করেন তিনি একজন দুর্বল জেনারেল।

প্রশ্ন : আপনি আগে বলেছেন পাঞ্জাব পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় নেবে। এ ব্যাপারে সরকার কী করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

খুশবন্ত : স্বাভাবিক অবস্থা ধাপে ধাপে আসবে। শ্রীমতী গান্ধী শিখ নেতৃত্বে একটি শূন্যতার সৃষ্টি করেছেন। অধিকাংশ শিখ নেতাই হয় জেলে, আর নয়তো জনগণের চোখে তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখন তাঁদের খুব শীঘ্রই কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত এবং হিন্দু আর শিখদের ভেতর আবার সেতুবন্ধনের প্রচেষ্টা এখনই শুরু করা উচিত। এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে ইতোমধ্যেই আমরা যথেষ্ট বিব্রত হয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় পাঞ্জাবে এখন হিন্দু এবং শিখদের ভেতরে একটা শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব দেখা দিয়েছে?

খুশবন্ত : এটা একটা খুব জটিল প্রশ্ন। এই দুই সম্প্রদায়ের ভেতর সম্পর্ক চিরকালই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, এমনকি বিবাহসূত্রেও এই দুই সম্প্রদায় আবদ্ধ হত। এর পেছনে অবশ্য কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা আছে যা কিনা হিন্দু এবং শিখ এই দুই সম্প্রদায়কে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকলে অবস্থা আবার স্বাভাবিক করা যেতে পারে। কিন্তু আজকের নেতারা, যাঁরা শুধুই এই দুই সম্প্রদায়ের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করে মুনাফা লুটতে চাইছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটাকে আরো ঘোরাল করে তুলছেন।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় আগামী নির্বাচনে বিরোধী পক্ষ কংগ্রেস (ই)-এর সার্থক বিকল্প হয়ে উঠতে পারবে?

খুশবন্ত : আমি এই ধরনের কোন ভবিষ্যৎবাণীর মধ্যে যেতে চাই না। তবে এটুকু আমি বুঝি যে, যদি খুব শীঘ্রই কংগ্রেস (ই)-র কোন বিকল্প গড়ে তোলা না হয় তাহলে দেশের সামনে বড় বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আর ব্যক্তিবিশেষ দিয়ে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে বিরোধী পক্ষে অনেক যোগ্য এবং সৎ নেতা রয়েছেন।

প্রশ্ন : যদি বিরোধী পক্ষ নির্বাচনে জয়লাভ করে, তাহলে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি কে হবেন বলে আপনি মনে করেন?

খুশবন্ত : হ্যাঁ, আমি চরণ সিং বা মোরারজী দেশাই-এর দাবির যথার্থতা খুঁজে পাই না – কারণ বয়স তাঁদের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা। তুলনামূলকভাবে কমবয়সীদের মধ্যে আমি মনে করি অটলবিহারী বাজপেয়ী, এল কে আদবানী, আর কে হেগড়ে, চন্দ্রশেখর, শারদ পাওয়ার, ফারুক আবদুল্লা – এঁরা ঐ পদের পক্ষে যথার্থ। □

"কিছু প্রেমের জোয়ার, ভাসিয়ে নিয়ে চলে অনন্তকাল ধরে..."

Zeenat Aman

" যেমন আমার রয়েছে প্রবল প্রেম,
সঙ্গীতের প্রতি—বইপত্তরের সঙ্গে অপূর্ব প্রীতির
বন্ধন—অভিনয়ের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা—
আর, অপরূপ লাক্সের সঙ্গে এই
মিষ্টিমধুর সম্বন্ধটিও"

শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।

HLL-9716

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন পৃথিবীর বহু রাজনৈতিক নেতা

৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮, সংবাদপত্র অফিসে টেলিপ্রিনটার-বাহিত হয়ে খবরটা এসেছিল এইভাবে :

FLASH! FLASH! FLASH! MAHATMA GANDHI WAS SHOT THRICE IN THE CHEST BY A YOUTH WHILE ON THE WAY TO THE PRAYER MEETING THIS AFTERNOON.

আরো দুবার এই একই কথার পুনরাবৃত্তির পর ভেসে এল পরবর্তী সংবাদ :

FLASH! FLASH! FLASH! A DOCTOR HAS BEEN CALLED.

তিন বার এই লাইনটি টেলিপ্রিনটার থেকে বেরিয়ে আসার খানিক পরেই এল সেই চরম ক্ষণ।

FLASH! FLASH! FLASH! MAHATMA GANDHI IS DEAD MAHATMA GANDHI IS DEAD MAHATMA GANDHI IS DEAD.

আততায়ীর গুলি এভাবেই একটি দীর্ঘ তালিকায় আর একটি নাম যোগ করল।

গুপ্তহত্যার খোঁজে ইতিহাসের পথ ধরে আমরা পিছিয়ে যেতে পারি।

অত্যাচারীর অপমৃত্যু

১৭৯৩-এর অগ্নিগর্ভ ফ্রানস। চার বছর আগেই ভেঙে পড়েছে বাসতিলের কারাগার। দু বছরের মধ্যে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত হয়েছে ফ্রানস। বিপ্লবী সরকারের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছে চরমপন্থী জ্যাকোবিনরা। সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে রোবসপিয়ের, দাঁতো, জাঁ পল মারার (Jean Paul Marat) নেতৃত্বে। এরই মধ্যে প্যারিসে এসে হাজির হল অতি সুন্দরী এক যুবতী শারলটে করডে। মেজর বেলজুনসের সঙ্গে একসময় প্রণয় ঘটেছিল করডের, কিন্তু ১৭৮৯-তে মারা তাঁর পত্রিকায় বেলজুনসকে ক্রমাগত আক্রমণ করলেন প্রতিবিপ্লবী বলে। ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল মেজর বেলজুনসের। শুধু ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহাই নয়, চারিদিকের এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইলেন করডে। রোবসপিয়ের ও দাঁতোকে ছেড়ে করডে বেছে নিলেন মারাকে। কিন্তু প্যারিসে এসেও খুব একটা সুবিধে হল না। জনসমক্ষে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন মারা। নিজের বাড়ির বাথটবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীর চুবিয়ে মারা ব্যস্ত থাকেন আক্রমণাত্মক লেখাপত্রে। সদ্য-কেনা একটা ছুরি নিয়ে প্রথমবার ও-বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা ব্যর্থ হল করডের। মারার সঙ্গিনী দরজার এপাশে আসতে দিল না করডেকে। ফিরে গেলেন করডে। বার করলেন অন্য উপায়। চিঠি দিয়ে কিছু সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে দেশের স্বার্থেই দেখা করতে চাইলেন মারার সঙ্গে। এবার ঢুকতে পারলেন করডে। বাথরুমেই ডেকে পাঠালেন মারা। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ওখানেই করডে গেলেন দেখা করতে। অভিযোগ শুনতে শুনতে ক্ষিপ্ত মারা মন্তব্য করলেন অপরাধীদের গিলোটিনে পাঠাবার কথা। গিলোটিন! শব্দটা শোনামাত্র ক্রোধে উন্মত্ত করডে পোশাকের আড়াল থেকে মুহূর্তে ছুরি বার করে বসিয়ে দিলেন মারার বুকের নিচে। নিশানা ঠিক ছিল। রোবসপিয়ের বা দাঁতোর মত গিলোটিনে যেতে হয়নি মারাকে। শারলটে করডের প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা সফল হয়েছিল।

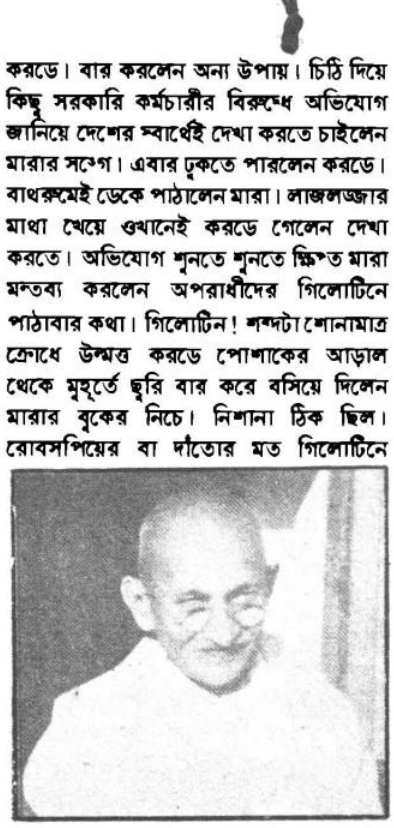

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শারলটে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর বাবাকে 'অনেক মানুষের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি আমি। বন্ধ করেছি আরো অনেক হত্যার পথ।' তাঁর প্রতিশোধের ইচ্ছে নেহাতই ব্যক্তিগত ছিল না।

জাঁ পল মারার মৃত্যু ঘটল আঠারশ শতকের শেষে। শুরু হল উনিশ শতক। আর বলা যেতে পারে এই শতক থেকেই শুরু হল গুপ্তহত্যার একটি নির্দিষ্ট প্যাটারন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রুশ বিপ্লবীরা এ পথকেই বেছে নিয়েছিলেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়বার প্রধান অস্ত্র হিসেবে, আমেরিকায় প্রেসিডেনটদের উপর শুরু হল আততায়ীদের আক্রমণ এই শতকেই। ১৮৩৫-এ অ্যানড্রু জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন রিচারড লরেনস। ১৮৬৫-তে জন উইলকস বুথ-এর গুলি কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে ভুল করেনি। আবরাহাম লিংকন হত্যার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল গুপ্তহত্যার এক স্বর্ণযুগের। এই সময়েই গুপ্তহত্যা হয়ে উঠল অনেক বেশি পরিকল্পিত যার প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই রুশ বিপ্লবীদের। সাফল্যের জন্য ছিনে জোঁকের মত লক্ষ্যবস্তুর পিছনে লেগে থাকা আর অনুপ্রেরণা হিসেবে এক ব্যাপক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য – রুশ বিপ্লবীদের হাতে তৈরি এই প্যাটারনকেই মূলত অনুসরণ করেছেন পরবর্তী আততায়ীরা। বাকুনিন, নেচায়েভ, পিটার ক্রপটকিন প্রমুখ রুশ অ্যানারকিসটদের এ পথের পাইওনিয়র বলা যায়।

অবশেষে লক্ষ্যভেদ

বহুদিন ধরেই অ্যানারকিসটদের লক্ষ্য ছিলেন রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজানডার। ১৮৬১তে ক্রিমিয়া থেকে মসকো ফেরার পথে জার-এর উপর গুলি চালিয়ে ব্যর্থ হন অ্যানারকিসটরা। '৬২ ও '৬৩তে আবিষ্কৃত হয়েছিল দুটি হত্যা পরিকল্পনা। ১৮৬৬-র ১৫ এপরিল লিংকন হত্যার বছরপূর্তিতে সামার গারডেনে প্রাতঃভ্রমণরত জার-কে লক্ষ্য করে ছোঁড়া কারাকসোভের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরের বছরই ফ্রানসে

তৃতীয় নেপোলিয়নের অতিথি জারকে রাস্তায় হত্যার চেষ্টায় পিস্তল বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় আততায়ীর। ১৮৭৫-এ মাইন বিস্ফোরণ থেকে রক্ষা পায় জার-এর ট্রেন। '৭৯তে আবার সামার গারডেনে সলোভিয়ফের গুলি ব্যর্থ হয়। ধৃত সলোভিয়ফের ফাঁসি হয়। ঐ বছরই চরমপন্থীদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসংগঠন 'Will of the People' জার-এর যাত্রাপথে পেতেছিল মাইন। বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার-এর মালপত্রবাহী ট্রেন, স্বয়ং জার থাকেন অক্ষত। ১৮৮০তে ছুতোর মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে উইনটার প্যালেসে যাতায়াতরত এক বিপ্লবী ডিনামাইট রেখে আসেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে প্রাসাদ। কিন্তু অতিথিদের দেরি হওয়ায় জার ডাইনিং রুমে তখন হাজির ছিলেন না। বিস্ফোরণে মৃত্য ঘটে ১৯ জন রক্ষীর। এমনই আতঙ্ক ছড়িয়েছিল যে জার কোন অপেরায় উপস্থিত থাকলে সাধারণ দর্শকেরা তার ধারেকাছেও থাকতেন না। একের পর এক মৃত্যুসম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে জার নিশ্চয়ই হাঁফ ছেড়েছিলেন যেদিন (১২ মারচ, ১৮৮১) 'Will of the People'-এর নেতা বে ঝলিয়াবফের ধরা পড়ার খবর পেলেন। কিন্তু ধৃত ঝেলিয়াবফ বেশ গর্বভরেই ঘোষণা করলেন যে হত্যার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। এবার আর রক্ষা পাবেন না জার আলেকজানডার। পরের দিন ১৩ মারচ। রবিবার। কারো নিষেধ না শুনেই জার চললেন মিখায়েল রাইডিং স্কুলে রক্ষীদের প্যারেড দেখতে। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। জার-এর এই যাত্রাপথের সম্ভাব্য প্রতিটি রাস্তায় পাতা হয়ে ছিল মাইন। বোমা ছোঁড়ায় ওস্তাদ কজন বিপ্লবী দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায়। ভাইয়ের বাড়িতে চা খেয়ে বরফঢাকা পথে নামলেন জার। কিছুটা এগোতেই রিয়াজকফ-এর হাত থেকে ছুটে এল প্রথম মৃত্যুবাণ। কিন্তু গাড়ির পিছনে পড়ায় খুব একটা ক্ষতি হয়নি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে জার গাড়ি থেকে নামলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন একে ওকে। তারপর আবার গাড়িতে উঠতে যাবেন ..... । কাছেই বোকা বোকা মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন গ্রিনেভেৎসিক। জার পাত্তা দেননি ওকে. উপেক্ষাই করেছিলেন বলা যায়। তার হাত থেকেই ছুটে এল দ্বিতীয়

জার দ্বিতীয় আলেকজানডার

বোমা। শব্দ ..... ধোঁয়া ..... বারুদের গন্ধে ভর্তি হয়ে গেল আবহাওয়া। ধোঁয়া সরে গেল ধীরে ধীরে, ছিন্নভিন্ন পোশাকে পড়ে আছেন জার। দুটি পা ক্ষতবিক্ষত। কাছেই বিস্ফোরণে নিহত গ্রিনেভেৎসিক ও রক্ষীসহ আরো কুড়িজন নিহত হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কুড়ি বছরের প্রচেষ্টার পর অবশেষে সাফল্য পেলেন বিপ্লবীরা। প্রবল প্রতাপান্বিত জার-এর হত্যা মামলায় ফাঁসি হয়েছিল ঝেলাবিয়েফ, রিয়াজানফ এবং দুই যুবতী সহ মোট ছ'জনের।

আততায়ীর ধারাবাহিক টারগেট মারকিন প্রেসিডেনট

রাশিয়ায় জার হত্যার দু'এক মাসের মধ্যেই উনচল্লিশ বছর বয়স্ক চারলস গুইতো-র (Charles Guiteau) গুলিতে রেলওয়ে স্টেশনে লুটিয়ে পড়লেন মারকিন প্রেসিডেনট জেমস আবরাহাম গারফিলড। এই ঘটনার পিছনে অনেকেই রুশ অ্যানারকিসট বাকুনিন, ক্রুপটকিনের আদর্শ আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছে ভেবে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রাক্তন প্রেসিডেনট গ্র্যানট সরাসরিই জানালেন 'I favour crushing it immediately by the prompt execution of the would-be assassins and their followers.' এখানে 'it' শব্দটির মধ্যে গ্র্যানট বুঝিয়েছিলেন অ্যানারকিসট পরিকল্পনাকে। যদিও দেখা যায় যে গুইতোর এই কাজ ছিল প্রেসিডেনটের প্রতি একান্তই ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত। লিংকন হত্যাকারী বুথের ছিল আদর্শের তাড়না। গৃহযুদ্ধে পরাজিত দক্ষিণের প্রতি সমবেদনা। যদিও সরাসরি রাজনীতির সংগে যুক্ত ছিলেন না জন উইলকিনস বুথ। থিয়েটারের অভিনেতা জন সস্তা জনপ্রিয়তা পেলেও অভিনয় ক্ষমতায় তাঁর বাবা কিংবা ভাই এডওয়ারডের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেননি কখনো। ১৪ এপরিল ১৮৬৫, ঐদিনই বিকেলে এক সরাইখানায় জনৈক মাতাল এ নিয়ে তাঁকে উপহাস করলে বুথ জবাব দিয়েছিলেন যে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমেরিকায় সবচেয়ে বিখ্যাত লোকের নাম হবে জন উইলকিনস বুথ। অন্যদিকে লিংকনও কি সচেতন ছিলেন না কোন ধরনের হত্যা-পরিকল্পনা সম্পর্কে? তাঁর মৃত্যুর পর ড্রয়ারে পাওয়া গিয়েছিল বদলা নেবার ভয় দেখান আশিটা চিঠি, দক্ষিণের দাসমালিকরা প্রচুর টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন তাঁকে হত্যার জন্যে। ১৮৬৩তেই আবিষ্কৃত হয়েছিল লিংকন হত্যার একটি প্লট। এতদসত্ত্বেও কর্মব্যস্ত মানুষটি এগিয়ে চলছিলেন নিজের পথে। হয়ত মানসিক বিশ্রাম চাইছিলেন লিংকন। তাই সেকরেটারির বারণ সত্ত্বেও ফোরড থিয়েটারে গিয়েছিলেন হাসির নাটকের মধ্যে খানিকক্ষণ সবকিছু ভুলে থাকতে। আর সেখানেই আবির্ভূত হলেন বুথ। একহাতে

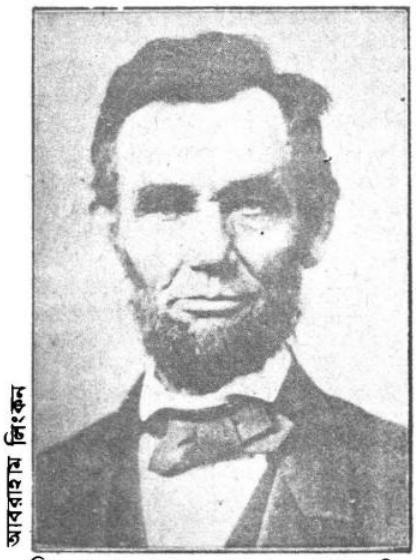

আবরাহাম লিংকন

পিস্তল, ড্যাগার অন্যহাতে। একটা হাসির দৃশ্যে সমস্ত দর্শক যখন ফেটে পড়েছেন অট্টহাস্যে, ঠিক তখনই নিজের সিটে ঢলে পড়লেন আবরাহাম লিংকন। মাথার ঠিক পিছনে লেগেছিল দুটো গুলি। লিংকন মারা গেলেন ন' ঘণ্টা পর। বুথের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল লিংকনকে কিডন্যাপ করে পরাজিত পক্ষের সৈন্যদের মুক্ত করা। কিন্তু অসম্ভব ভেবে সে পথ ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন সরাসরি হত্যার পথ। সাফল্য বুথ পেলেন। প্রথম মারকিন প্রেসিডেনট হত্যাকারী হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রইলেন – যে সুযোগ কখনই পেতেন না অভিনেতা বুথ। লিংকন হত্যার বারো দিন পর পলাতক বুথের মৃত্যু ঘটে এক সৈন্যের গুলিতে।

পাশাপাশি প্রেসিডেনট গারফিলডের উপর গুইতোর আক্রোশ ছিল অন্য ধরনের। রিপাবলিকান পারটির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে 'কমপ্রোমাইজ ফরমুলা'য় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জেমস গারফিলড। পুলিশ ম্যাজিসট্রেটের ছেলে চারলস গুইতো নিজে থেকেই ক্যাডার হয়ে খাটাখাটনি করেছিলেন গারফিলডের হয়ে। লেখা, প্রকাশনা, বীমা কোমপানির দালালি – একের পর এক পেশায় ব্যর্থ হয়ে গুইতো এবার চাইলেন সাফল্যের পুরস্কার, সরাসরি হোয়াইট হাউসে এসে রাষ্ট্রপতিকে জানালেন তাঁর মনোবাঞ্ছা। তাঁর ইচ্ছে অসট্রিয়ায় রাষ্ট্রদূত হবার। পরে অবশ্য অসট্রিয়ার বদলে গুইতো বেছে নেন প্যারিস। একের পর এক আবেদন নিবেদনে তিতিবিরক্ত সেকরেটারি অব স্টেট ব্লেয়ার একদিন অফিস থেকে তাড়িয়ে দেন গুইতোকে। ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করে হোয়াইট হাউসে চিঠি পাঠিয়েছিলেন গুইতো। স্বভাবতই কোন জবাব আসেনি। ক্ষিপ্ত গুইতো ঐদিনই গারফিলডকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। ২ জুলাই কর্মক্লান্ত গারফিলডের চার মাসের ছুটিতে পরিবারসহ ভ্রমণে বেরনর

এখন সিঙ্গার থেকে পাবেন আরো বোনার মানে আরো টাকা আনার নানান সহজ উপায়!

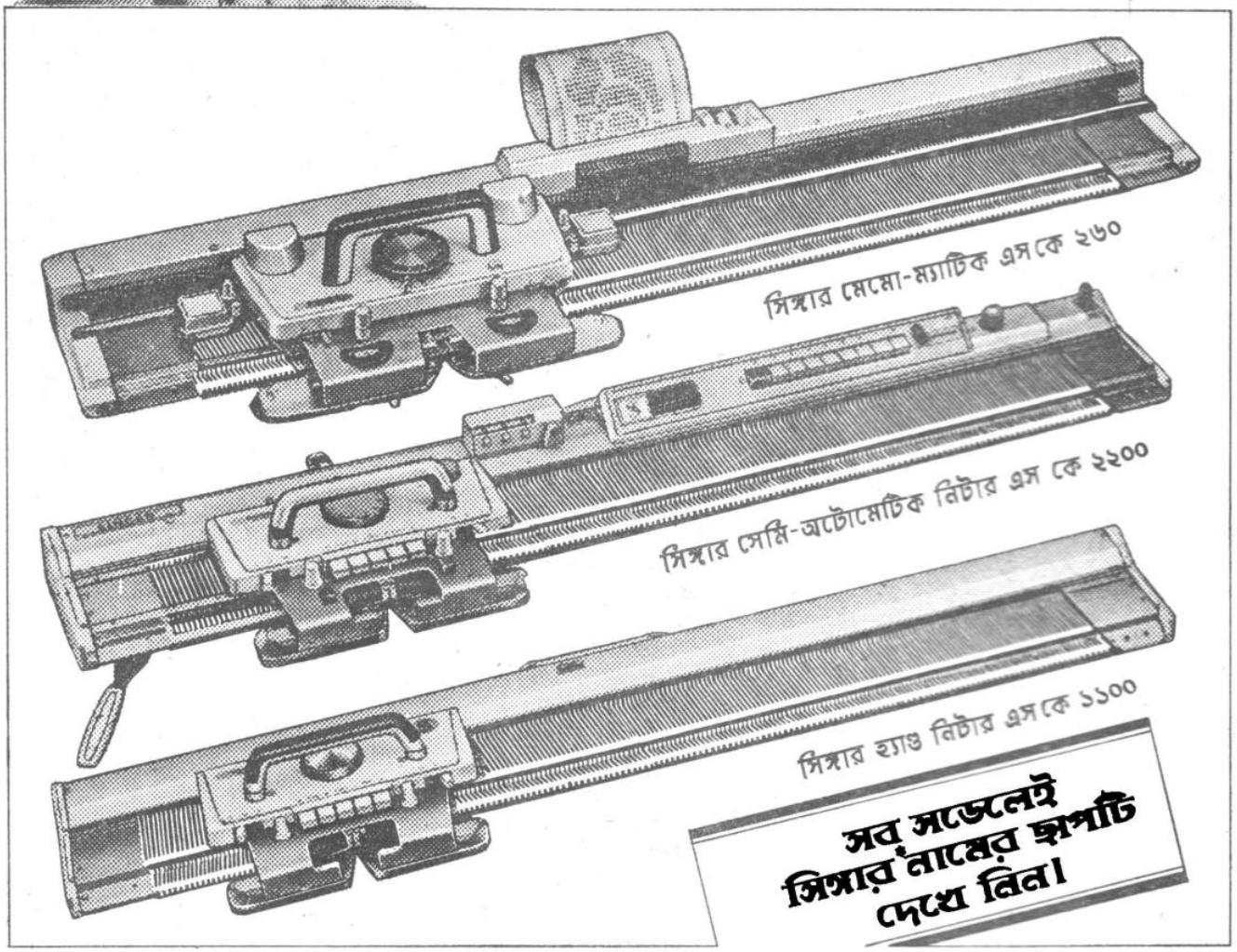

বাজারে এই সর্ব-প্রথম নিটিং মেশিনের এমন বিপুল সম্ভার হাজির হ'ল যা প্রত্যেকের দরকারের মানানসই···প্রত্যেকের [illegible] এগুলি সবই এমন চমৎকার ভাবে ডিজাইন করা, যা দিয়ে কটন, উল বা সিন্থেটিক ইয়ার্ণের চমৎকার সব পোশাক-[illegible]··· চটপট্ টাকা ঘরে আনতে পারবেন। বিনাখরচে নিজের চোখে দেখে শেখার জন্য যেকোনও সিঙ্গার ডীলার বা সিঙ্গার [illegible] সিঙ্গারের ওপর আপনাদের অগাধ বিশ্বাস তো আছেই। আর সেইজন্যেই সিঙ্গারের সেরা কোয়ালিটি আর বিক্রীর পর [illegible] সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন।

ইণ্ডিয়ান সিউইং মেশিন কোম্পানী লিমিটেড
(ইউ.এস.এ'র দি সিঙ্গার কোম্পানীর সহযোগী সংস্থা।)
২০৭, ডি. এন. রোড, বম্বে ৪০০ ০০১।
* দি সিঙ্গার কোম্পানীর ট্রেডমার্ক

সিঙ্গার*

নিটিং মেশিন

—বোনার টেকনিকে শ্রেষ্ঠ যারা তাদেরই সৃষ্টি করা

CHAITRA-SM-549 BEN

কথা। ট্রেন ছাড়বে বালটিমোর-এর পোটোম্যাক ডিপো থেকে। সকাল ৯-৩০-এ। ওখানেই ভোর পাঁচটা থেকে সদাকেনা ৪৪ ক্যালিবারের পাঁচঘরা রিভলভার নিয়ে বসে রইলেন গুইতো, নিজের ভবিষ্যৎ হত্যার দায়িত্ব অগ্রিম জানিয়ে দুটো চিঠি লেখেন হোয়াইট হাউস ও মারকিন সেনাবাহিনীর কমানডার-ইন-চিফকে। এর আগেই ওয়াশিংটনের জেলখানা বাইরে থেকে একঝলক দেখে এসেছিলেন। মন্দ লাগেনি। স্টেশনে এসে একজন লোককে ভাড়া করেন যাতে সে গুইতোকে পুলিশের কাছে নিয়ে যায়। ৯-১৫-র সময় লেডিজ ওয়েটিং রুমে জনৈকা মিসেস হোয়াইট গুইতোর খাপছাড়াভাব লক্ষ্য করে পুলিশকে জানাতে সবে বেরচ্ছেন ঠিক তখনই সদলবলে গারফিলড এসে হাজির। ট্রেনের সময় জিগ্যেস করে ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন ব্রেয়ার আর গারফিলড। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে গুইতো। গারফিলড এগিয়ে যেতেই ছুটে এল প্রথম গুলি। ঘুরে দাঁড়ালেন গারফিলড। দ্বিতীয় গুলি শুইয়ে দিল তাঁকে। বেশ কিছুদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে ১৯ সেপটেমবর গারফিলড-এর মৃত্যু হয়। মস্তিষ্কবিকৃতির প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ গুইতো আদালতের রায়ে ফাঁসিতে ঝোলেন পরের বছরের জুন মাসে।

গুপ্তহত্যার স্বর্ণযুগ

১৮৬৫ থেকে ১৯১৪ – এই দীর্ঘসময়কে কেন গুপ্তহত্যার স্বর্ণযুগ বলা হয় তা নিশ্চয়ই বোঝা যাবে যদি আমরা সফল আততায়ীদের শিকারের দীর্ঘ তালিকায় চোখ বোলাই।

১৮৬৫ : আবরাহাম লিংকন, ১৮৬৮ : সারবিয়ার কিং মাইকেল, ১৮৭০ : স্পেনের প্রধানমন্ত্রী জুয়ান প্রিম, ১৮৭২ : ভারতবর্ষের ভাইসরয় লরড মেয়ো, ১৮৭৫ : ইকোয়েডর-এর প্রেসিডেনট গ্যাবরিয়েল মরেনো, ১৮৭৬ : তুরসকের সুলতান আবদুল আজিজ, ১৮৮১ : জার দ্বিতীয় আলেকজানডার এবং জেমস গারফিলড, ১৮৯৪ : ফরাসি প্রেসিডেনট সাদি কারনো, ১৮৯৬ : পারস্যের শাহ, ১৮৯৭ : অসট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং স্পেনের প্রধানমন্ত্রী ডেল ক্যাসতিলো, ১৮৯৮ : গুয়াতেমালার প্রেসিডেনট জুয়ান ব্যারিয়স, ১৯০০ : ইতালির কিং উমবারতো, ১৯০১ : মারকিন প্রেসিডেনট উইলিয়ম ম্যাকিনলে, ১৯০৩ : সারবিয়ার কিং আলেকজানডার ও কুইন ড্রাগা, ১৯০৫ : রাশিয়ার গ্র্যানড ডিউক সারজিয়াস, ১৯০৭ : গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী ডেলিয়ানিস ও বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী পেতকভ, ১৯০৮ : পরতুগালের রাজা কারলোস ও উত্তরাধিকারী প্রিনস লুইস, ১৯১০ : মিশরের প্রধানমন্ত্রী পাশাগালি, ১৯১১ : ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেনট কেসারস, ১৯১২ : স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মেডেস, ১৯১৩ গ্রীসের কিং জরজ এবং মেকসিকোর প্রেসিডেনট ফ্রানসিসকো মাদেরো, ১৯১৪ অসট্রিয়ার আরচডিউক ফ্রানজ ফারদিনানদ।

১৯১৪ সালে গ্যাভরিলো প্রিনসিপ-এর গুলি ডেকে এনেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অসট্রিয়ার আরচডিউক ফ্রানজ ফারদিনানদ আর স্ত্রীর হত্যাকারী প্রিনসিপ সাধারণ মানুষের কাছে সেই সম্মান পেয়েছিলেন যা ১৯০৮ সালে পরতুগালের রাজতন্ত্রবিরোধী জনগণ দিয়েছিল রাজা প্রথম কারলোস ও তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র লুইসের দুই হত্যাকারী ম্যানুয়েল বুইকা ও আলফ্রেডে কোসটাকে। এই হত্যার দু বছরের মধ্যেই পরতুগাল রূপান্তরিত হয় প্রজাতন্ত্রে। বুইকা ও কোসটার স্মৃতিস্তম্ভ তাঁদের কাজের প্রতি পরতুগালবাসীদের শ্রদ্ধার প্রতীক। সারাজেভোর নায়ক প্রিনসিপও অমর হয়ে আছেন একটি স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে। এতে খোদাই আছে তাঁর পায়ের ছাপ। পাশেই মিলজ্যাকা নদীর উপর সেতুটিও বহন করছে প্রিনসিপ-এর নাম। প্রিনসিপ-এর জীবন ও কাজকর্ম সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে মিউজিয়ম। নায়ক হবার বাসনা ছিল গুইতো এবং ১৯১২ সালে থিওডোর রুজভেলটের উপর আক্রমণের ব্যর্থ ঘাতক জন শ্রাংক-এরও। 'Here lies the body of Charles Guiteau, Patriot & Christian. His soul is in glory' – গুইতোর ইচ্ছে ছিল তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে লেখা থাক এ কথাকটি। শ্রাংক চেয়েছিলেন নিউ ইয়রক হিসটরিকাল সোসাইটিতে রাখা হোক তাঁর রিভলভার ও বুলেট। রক্ষিত হয়নি তাঁদের সেই ইচ্ছে, কিন্তু আমেরিকার Biscayne Bay-তে মেয়র অ্যানটন সেরম্যাক-এর উদ্দেশে স্থাপিত একটি স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে উৎসর্গীকৃত কয়েকটি শব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয় কোন বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তির হত্যার তাৎপর্য কতদূর বিস্তৃত হতে পারে। দ্বিতীয় প্রেসিডেনট হয়েছেন রুজভেলট। বিশ্বপরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আমেরিকা খাবি খাচ্ছে মন্দার বাজারে। এই অবস্থায় দেশের হাল ধরলেন রুজভেলট। ফেবরুয়ারির ১৫ তারিখ, ১৯৩৩, Biscayne Bay-তে রাতে এক জনসভায় বক্তৃতা শেষ করতেই রাজমিস্ত্রি জুসিপি জাংগারা (Ginseppe Zangara) পাঁচবার গুলি চালালেন রুজভেলটকে লক্ষ্য করে। জীবনে দ্বিতীয়বার আততায়ীর গুলি থেকে রুজভেলট রক্ষা পেলেও লুটিয়ে পড়লেন মেয়র সেরম্যাক। এখন যে কেউ ওখানে গেলেই দেখবেন সেরম্যাকের সেই স্মৃতিস্তম্ভ, আর চোখে পড়বে কয়েকটি শব্দ, 'I am glad, it was me instead of you'। দেখতে দেখতে আপনি নিশ্চয়ই ভাবতে চেষ্টা করবেন কী ঘটত রুজভেলট সেদিন নিহত হলে! হয়ত, সত্যি সত্যিই ঐ টালমাটাল দিনগুলির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠত এক অন্য ইতিহাস।

রুজভেলট কাহিনী বলতে গিয়ে যে কথা আমরা ছেড়ে এসেছি তা হল যে এই ব্যর্থ অভিযানের অনেক আগেই কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে উইলিয়াম ম্যাকিনলে তৃতীয় মারকিন প্রেসিডেনট হিসেবে নিহত হয়েছেন। ১৯০১ সালের ৬ সেপটেমবর এক সভায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে করমর্দন করছিলেন ম্যাকিনলে। পালা এল ডানহাতে বিশাল রুমালের ফেট্টি বাঁধা লিয়ন চোলগস-এর (Lion Czolgosz)। আহত হবার ভান করে চোলগস রুমালের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন রিভলভার। ম্যাকিনলে করমর্দন করতেই দুবার ট্রিগারে চাপ দিলেন চোলগস। বুক ও তলপেটে গুলিবিদ্ধ ম্যাকিনলে আট দিন পর মারা যান।

আরচডিউক ফ্রানজ ফারদিনানদ-এর হত্যায় যে বিশ্বযুদ্ধের শুরু তা শেষ হল একসময়। সময় এগোতে লাগল ক্রমশ। সংবাদে ভরা সমস্ত বিশ্ব। একদিকে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে রাশিয়া, ইতালিতে ফ্যাসিবাদের জয় সমাপ্ত, অন্যদিকে তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্লোগান নিয়ে জারমানিতে দ্রুত উঠে এসেছেন হিটলার। গুপ্তঘাতকদের কাজকর্ম চলছে খানিকটা ঢিমেতালে। রাশিয়ায় ব্যর্থ হয়েছে লেনিন হত্যার প্রচেষ্টা। যদিও আততায়ীর গুলি অনেকাংশেই দায়ী ছিল দু'-একবছর পর তাঁর অসুস্থতাজনিত মৃত্যুর জন্য। এরপর থেকে গোটা তিরিশের দশক জুড়ে আমরা দেখব বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক ক্ষমতা বৃদ্ধির টানাপোড়েনে প্রতাপশালী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বেছে নিয়েছেন গুপ্তহত্যা নামক অস্ত্রটিকে।

এই অস্ত্রটিকে কাজে লাগিয়েই হিটলার তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রুডলফ ফরমিসকে হত্যা করে তাঁর পথ নিষ্কণ্টক করেন। পাশাপাশি অসট্রিয়ার ফ্যাসিবিরোধী চ্যানসেলর এংগেলবারট ডলফুসকে শায়েস্তা করতে হিটলার-এর প্ররোচনায় অসট্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল নাজিদের গুপ্তসংগঠন। এই সংগঠনের নেতা ক্যাপ্টেন অটো প্ল্যানেত্তার গুলিতে ১৯৩৪-এর ২৫ জুলাই নিহত হন ডলফুস। ধরা পড়েন প্ল্যানেত্তা। হিটলার এই হত্যার নিন্দা করলেও ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুর আগে অটো প্ল্যানেত্তা ও তাঁর সঙ্গী হলজওয়েবার হিটলারের জয়গান করে যে সন্দেহকে প্রকট করেছিলেন ১৯৩৮-এ তাঁদের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করে স্বয়ং হিটলার স্পষ্ট করেন সেই ধারণাকে। অন্যদিকে হিটলারকে হত্যার চেষ্টাও চলেছিল কয়েকবার। কিন্তু ব্যর্থ হয় তা।

১৯৩৪ সালেই ফ্রানসে রাষ্ট্রীয় সফরে ভ্রমণরত যুগোশ্লাভিয়ার রাজা প্রথম আলেকজানডার ফরাসি বিদেশমন্ত্রী লুই বারথোর সঙ্গে একই ঘোড়ার গাড়িতে সফরকালে নিহত হন।

অন্যদিকে একের পর এক পথের কাঁটা সরাতে সরাতে মুসোলিনি এসে পৌঁছলেন ১৯৩৯-এ। সামনে বাধা বলতে একাশি

সুপার রিন
আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা
যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই।

সুপার রিন-এর দিকে আর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখুন।
চমৎকার নতুন মোড়ক—আর, আহ্, অপূর্ব এক নতুন সুগন্ধ!

সুপার রিন-এর শুভ্রতার দিকে আর একটু লক্ষ্য করে দেখুন।
সুপার রিন শুভ্রতার শক্তির ভরপুর এক ভাণ্ডার। এ আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা, যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই। আপনি নিজেই দেখুন না—সুপার রিনে কাচা জামাকাপড় এমন ধবধবে সাদা হয় যে সবার মাঝে লোকের নজর কেড়ে নেয়।

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বছরের বৃদ্ধ পোপ দশম পায়াস স্বয়ং। ঐ বছরের দশ ফেবরুয়ারি পোপ ডেকে পাঠালেন ইউজিন কারকিনাল টিসেরাকে। তাঁর ইচ্ছে জনসভায় ফ্যাসিবিরোধী ভাষণ দেওয়ার। কিন্তু এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন পোপ। ভ্যাটিকানের প্রবীণ চিকিৎসক ডঃ ফুান-সিসকো পেত্রুচচি পোপকে তাজা করে তুলতে একটা ইনজেকশন দিলেন। সেই শেষ। পোপ আর কথা বলেননি, বহুদিন পর টিসেরা তাঁর আত্মকথায় এটিকে হত্যা বলেই জানিয়েছেন। টিসেরার কথাকে সত্যি বলেই মনে হয় যখন আমরা খোঁজ পাই যে ডঃ পেত্রুচচির কন্যাই হলেন মুসোলিনির ইতিহাসখ্যাত অবৈধ প্রণয়িনী ক্লারেতা পেত্রুচচি।

অন্যদিকে রাশিয়ার দিকে চোখ ফেরালে দেখব যে এই হল সেই সময় যখন একের পর এক বিরোধী কমিউনিসটকে নিকেশ করে জোসেপ স্তালিন হয়ে উঠেছেন অপার ক্ষমতাশালী। কিন্তু তখনও একটা কাঁটা খচখচ করছে মনে। বিশের দশকের শেষভাগে দেশ থেকে বিতাড়িত লিয়ন ট্রটস্কি বিদেশে বসে এখনও সক্রিয়। লেখাপত্রের মাধ্যমে এখনও তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর লড়াই। যদিও একটা সুবিধে এই যে রুশ আইন 'দেশের পক্ষে বিপজ্জনক' বলে পরিচিত যেকোন 'শত্রু'কে বিশ্বের যে কোন জায়গায় শাস্তি দেবার ক্ষমতা সরকারকে দিয়েছে। ১৯৪০-এই নির্বাসিত ট্রটস্কির জীবনের শেষ দিন ঘনিয়ে এল। গুপ্তহত্যার ইতিহাসে এর চেয়ে পরিকল্পিত কোন হত্যার কাহিনী এর আগে ঘটেনি।

অজ্ঞাত আততায়ী

রুশ বিপ্লবের অন্যতম নায়ক রেড আরমির কম্যানডার-ইন-চিফ লেভ ডেভিডো-ভিচ ব্রনস্টাইন বা লিয়ন ট্রটস্কি বিশ দশকের শেষে বিতাড়িত হলেন দেশ থেকে। লেনিনের মৃত্যুর পর ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন ট্রটস্কি। স্তালিন ব্যাপ্ত করেছিলেন নিজেকে পারটির ভিতরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে। ট্রটস্কি বিতাড়নের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটল একটি পর্যায়ের। বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পেতে ব্যর্থ হলেন ট্রটস্কি। অবশেষে আশ্রয় মিলল মেকসিকোয়। এখানে বসেই ট্রটস্কি লিখে চললেন তাঁর আত্মজীবনী এবং তীব্র সমালোচনা চালালেন স্তালিনের উপর। অন্যদিকে রাশিয়ায় ততদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ট্রটস্কিপন্থীরা। মেকসিকোতে সেই আলশকায় দিবারাত্রি ট্রটস্কির বাড়ি পাহারা দিতেন অনুগামীরা।

এই যখন অবস্থা তখন মেকসিকো ছাড়িয়ে বহুদূরে ঘটে চলেছে অন্য এক নাটক। ট্রটস্কির বোন আমেরিকাবাসী ক্লিনিকাল সাইকলজিসট সিলভিয়া অ্যাগনফ এসে পৌঁছালেন প্যারিসে। সাতাশ বছরের যুবতি সিলভিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল বেলজিয়মের এক ধনী পরিবারের সন্তান জ্যাকুইস মরনারড-

লিয়ন ট্রটস্কি

এর। প্রথম আলাপেই প্রেম। সেটা ১৯৩৮-এর জুলাই মাস। মরনারড কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী নন। তাঁর পেশা কাগজে লিখে টাকা রোজগার। পরের বছর ফেবরুয়ারিতে সিলভিয়া ফিরে আসেন আমেরিকায়। একটি কাগজের সমর সাংবাদিক হিসেবে মরনারড-এরও আসার কথা কিছুদিনের মধ্যে। মরনারড এলেন অনেক পরে, সেপটেমবরে। এবার তাঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন। সাংবাদিক নয়, এবার এসেছেন একটি কোমপানির চাকরি নিয়ে যারা মেকসিকো থেকে বিভিন্ন দেশের কাঁচামাল রপ্তানী করে। যুদ্ধের ডামাডোলে স্বাধীন-ভাবে ঘোরাফেরা করার জনাই নিজের বেলজিয়ান নাম পালটেছেন বলে জানান মরনারড। অকটোবরেই মেকসিকো পাড়ি দেন জ্যাকসন। সিলভিয়াও আসেন কিছুদিন পরে। সিলভিয়ার ভাবী স্বামী হিসেবে ট্রটস্কিমহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন জ্যাকসন। ১৯৪০-এর মারচে আমেরিকা ফিরে যান সিলভিয়া। এর কিছুদিন পরেই মে মাসে কে বা কারা ভোর চারটে থেকে ট্রটস্কির বাড়ি লক্ষ্য করে মেসিনগান চালায়। অপহৃত হন একজন রক্ষী সেলভন হারট। অল্পের জন্য ট্রটস্কি রক্ষা পেলেও হারটকে মাসখানেক বাদে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ২৪ মে জ্যাকসন পরিচিত হন ট্রটস্কির সঙ্গে। ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা। ৩০ মে থেকে ১২ জুন-এর মধ্যে তিনবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এরপর বহুদিন পাত্তা নেই জ্যাকসনের। ২৯ জুলাই আবার হাজির জ্যাকসন। পরিচিত মুখ দেখে এই প্রথম খানাতল্লাসী ছাড়াই রক্ষীরা ভিতরে যেতে দেন জ্যাকসনকে। জ্যাকসন কিন্তু ওখান থেকেই ফিরে যান খুশি মনে। আগসটে সিলভিয়া আবার আসেন মেকসিকোয়। দুজনেই ৮ ও ১০ আগসট দুবার দেখা করেন ট্রটস্কির সঙ্গে। ১৭ তারিখ জ্যাকসন তাঁর একটা লেখা দেখাতে যান ট্রটস্কিকে। আলোচনার জন্য ট্রটস্কি তাঁকে আবার আসতে বলেন ২০ আগসট। নির্দিষ্ট দিনে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এক হাতে রেনকোট ব ঝুলিয়ে ভিতরে চলে যান জ্যাকসন। খানিক বাদেই একটা পাশবিক আর্তনাদ শুনে রক্ষীরা দৌড়ে ঢোকেন ভিতরে। মুখ ভর্তি রক্ত নিয়ে ট্রটস্কি পড়ে আছেন স্টাডিরুমের সামনে। জ্যাকসনের ডান হাতে ধরা অটোমেটিক পিস্তল। যদিও আঘাত করেছিলেন রেনকোটের তলায় লুকোনো পাহাড়ে ওঠার ধারালো গাঁইতি দিয়ে, ট্রটস্কির মাথা চিরে নিচে নেমে এসেছিল তা। ধরা পড়লেন জ্যাকসন। 'ওরা আমার মাকে জেলে বন্দী করে এপথে আসতে বাধ্য করেছে' এ কথাটি ছাড়া আর কিছুই বলেননি জ্যাকসন। অনেক চেষ্টাতেও তাঁর আসল নাম বা পরিচয় বার করা যায়নি। কুড়ি বছর পরে ১৯৬০ জেল থেকে ছাড়া পাবার পর মরনারড ওরফে জ্যাকসনকে শেষবার দেখা গিয়েছিল একটি বিদেশগামী জাহাজ ধরতে অদ্ভুত এক ধাঁধা তৈরি করে গেলেন লিয়ন ট্রটস্কির সফল আততায়ী।

ট্রটস্কি হত্যার পরই চল্লিশের দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতবর্ষে গান্ধী হত্যা। সে ঘটনা সকলেরই জানা সুতরাং এই ঘটনাসহ নিরুত্তেজ পঞ্চাশের দশক টপকে আমরা চলে যাব ষাটের দশকে উত্তেজনার কেন্দ্রভূমি আমেরিকায়।

রহস্যময় এক হত্যা

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এর সময় থেকেই ক্যাস্ত্রোর কিউবাকে উল্টে দেবার চেষ্টা চালিয়েছিল আমেরিকা ১৯৬১ র সেই বিখ্যাত 'Bay of Pigs'-এর ঘটনা নতুন প্রেসিডেনট কেনেডির আমলেও কোন পরিবর্তন ঘটল না এ মনোভাবের আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এরই মধ্যে ১৯৬৩ র নভেমবরে শুরু হল কেনেডির টেকসাস সফর। প্রথম গন্তবাস্থান ডালেস

১৯৬৩-র ২২ নভেমবর। বিমানবন্দর থেকে বিশাল মোটরবাহিনী এগিয়ে আসছে শহরের অভ্যন্তরে। প্রথম গাড়িতে নিরাপত্তা বাহিনী। দ্বিতীয় গাড়ির সামনের সিটে

জন কেনেডি

সস্ত্রীক গভরনর কনোলি, পিছনের সিটে স্বয়ং জন কেনেডি ও স্ত্রী জ্যাকলিন। পিছনেই সিকরেট সারভিস এজেনটদের গাড়ি। রাস্তায় ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। আস্তে হয়ে আসছে গাড়ির গতি। সংগে সংগে এজেনটরা রাস্তায় নেমে ঘিরে দাঁড়াচ্ছেন প্রেসিডেনটের লিমুসিন। এবার হাউসটন স্ট্রিট। খুব আস্তে চলছে গাড়ি। ডানদিকে Deaky porta Triangular Park-এ ইতস্তত ছড়ান লোকজন। এজেনট ক্লিনটন হিল-এর চোখ সেদিকে। হঠাৎই একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে হিল তাকিয়ে দেখলেন গলায় হাত দিয়ে ঢলে পড়ে যাচ্ছেন প্রেসিডেনট। হিল-এর উপর দায়িত্ব জ্যাকলিনের নিরাপত্তার। গাড়ি থেকে নেমে দৌড়তে দৌড়তেই আবার গুলির আওয়াজ। আবার .....। লিমুসিনের ভিতর তখন এক বীভৎস দৃশ্য। সামনের সিটে রক্তাক্ত শরীরে স্ত্রীর কোলে ঢলে পড়েছেন গভরনর কনোলি। আর পিছনের সিটে কেনেডিকে জড়িয়ে বিহ্বল জ্যাকলিন। মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল কেনেডির। প্রথম গুলি কেনেডিকে আঘাত করে গিয়ে ঢুকেছিল কনোলির শরীরে। দ্বিতীয় গুলি সরাসরি বিদ্ধ হয়েছিল কেনেডির মাথার ডানদিকে। খুলির একাংশ ছিটকে পড়েছিল সিটের উপর। বেরিয়ে এসেছিল ঘিলু। কনোলি রক্ষা পেলেও মাত্র ন' সেকেনডের মধ্যে কেনেডির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

চব্বিশ বছরের আততায়ী লি হারভে অসওয়ালড ধরা পড়লেন সেদিনই। কিন্তু অসওয়ালড স্বীকার করেননি নিজের অপরাধ। শেষ পর্যন্ত কী হত কে জানে, কিন্তু রাত দশটায় তাঁকে যখন জেলে নেবার জন্য গাড়িতে তোলা হচ্ছে তখনই ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জ্যাক রুবেনস্টাইন (জ্যাক রুবি) গুলি করে হত্যা করেন অসওয়ালডকে। পরে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে কেনেডির আসল হত্যাকারি অসওয়ালড নয়, অন্য কেউ। আততায়ী গুলি চালিয়েছিল একটি অফিস বিলডিং-এর ছ'তলা থেকে। এর আগে রাশিয়ার নাগরিকত্বের জন্য ঘোরাঘুরি করে অসওয়ালড ফিরে এসেছিলেন আমেরিকায়। বিয়েও করেছিলেন এক রুশ যুবতী মারিয়া ত্রেশকেভাকে। ক্যুবা বিপ্লবের সাফল্য তাঁকে করে তুলেছিল উগ্র ক্যাস্ট্রোপ্রেমী। ঘৃণা করতেন মারকিন ষড়যন্ত্রকারীদের। কিন্তু এটুকুই কি ছিল অসওয়ালডের কেনেডি হত্যা পরিকল্পনার চালিকাশক্তি? নাকি, অসওয়ালডকে শিখন্ডি করে জয়ী হল আরো বড় কোন ষড়যন্ত্র? জ্যাক রুবির রিভলভার সে কথা জানার কোন সুযোগ দেয়নি।

দি কিং ইজ ডেড, লং লিভ দি কিং

ষাটের দশকে তুংগে উঠেছিল আমেরিকায় কালো মানুষের লড়াই। একদিকে চরমপন্থীরা এবং অন্যদিকে খৃস্টধর্মের বাণী প্রচাররত

মারটিন লুথার কিং (জুনিয়র)

মারটিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর অনুগামীরা শক্তিশালী হচ্ছিলেন ক্রমশই। ১৯৬৮-এর ৪ এপরিল মেমফিস-এ পৌঁছলেন মারটিন লুথার কিং। উদ্দেশ্য ছিল ধর্মঘটী নিগ্রোদের মনোবল বাড়ান। সন্ধ্যে ছ'টায় মোটেলে ডিনার করতে ঢুকলেন কিং। আর কিছুক্ষণের মধ্যে মেমফিস চারচে তাঁর ভাষণ দেবার কথা। সে সুযোগ আর পেলেন না কিং। মোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই দুশো ফিট দূর থেকে ছুটে এল গুলি, শিরদাঁড়া ভেঙে দুমড়ে পড়লেন কিং। এক ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে সব শেষ।

গুলি করেছিলেন জেমস আরল রে। একজন দাগী ক্রিমিনাল। যদিও খুব উঁচুদরের কেউ নয়, একটা সময় যোগ দিয়েছিলেন মিলিটারি সারভিসে। নিয়মানুবর্তীতার সংগে খাপ খাওয়াতে না পারায় চাকরি যায় তাঁর। এরপরই জড়িয়ে পড়েন অপরাধ জগতের সংগে। ১৯৬০-এ লুটের অভিযোগে কুড়ি বছর জেলও হয়। কিন্তু তিনবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯৬৭-তে জেল ভেঙে বেরোন রে। তারপরই এই হত্যা। গুলি ছুঁড়ে রাইফেল ফেলে রে বেরিয়ে পড়েন ঐ বাড়ি থেকে। গাড়ি চালিয়ে পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন স্থানে। এদিকে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন (এফ বি আই)-এর জোর তল্লাশীর ফলে ৮ জুন লনডনে ধরা পড়েন জেমস আরল রে। বিচারে নিরানব্বই বছরের জেল হয় রে'র। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা প্রশ্নের মীমাংসা হল না। রে'র উদ্দেশ্য কী ছিল, কারা ছিল তাঁর পিছনে. কেই বা জুগিয়েছিল টাকা? কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এমনকি ঐ মামলার বিচারকও মন্তব্য করেছিলেন, 'অনেক কিছুই পরিষ্কার হল না!'

আবার কেনেডি

১৯৬৮-র ৬ জুন আমেরিকার টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরে স্থির ছিল একটি মাত্র শব্দ : SHAME! কিছুক্ষণ আগেই মৃত্যু ঘটেছে নিহত প্রেসিডেনট জন এফ কেনেডির ভাই ডেমোক্র্যাটিক পারটির সেনেটর রবারট কেনেডির। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পারটির প্রার্থীপদের জন্য লড়াই চলছিল কেনেডি বনাম ইউজিন ম্যাকারথির। মাঝরাতে খবর এল কেনেডির সাফল্যের। ঐ রাতেই প্রায় ২০০০ সমর্থক-এর মধ্যে নেমে আসতে হল উৎফুল্ল কেনেডিকে। হোটেল অ্যামবাসাডর-এর এমব্যাসি রুমে তখনই আয়োজন করা হল একটি তাৎক্ষণিক সভার। সভা ভাঙল। বিশালদেহী ফুটবলার রুজভেলট গ্রিয়ার, অলিমপিক ডেকাথলন চ্যামপিয়ন নিগ্রো অ্যাথলিট রাফের জনসন ও কেনেডির বডি গারড উইলিয়ম বেরি ভিড় পরিষ্কার করতে করতে কেনেডিকে নিয়ে চললেন হোটেলের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা কিচেন রুমের এলিভেটরের দিকে। রান্না ঘরের কাছাকাছি কেনেডিকে অভিনন্দন জানালেন হোটেলের কর্মচারীরা। কেনেডি হাসছেন ... ...। আর তখনই শোনা গেল কানফাটানো আওয়াজ। টেলিভিশন ইউনিটের একজন কর্মী আওয়াজের আগে শুধু শুনতে পেয়েছিল একটা কথা : 'কেনেডি, ইউ আর এ বিচ!' তারপরই লুটিয়ে পড়লেন কেনেডি। আততায়ী সিরহান বিশারা সিরহানকে ততক্ষণে জড়িয়ে ধরেছেন অনেকে। সেই অবস্থাতেই সে গুলি চালাল এলোপাথাড়ি। দাদার মত রবারটেরও গুলি লেগেছিল খুলিতে। গুঁড়ো হয়ে গেছিল ডানদিকটা।

ধরা পড়লেন চব্বিশ বছরের সিরহান। প্যালেস্তিনিয় লক্ষ্যের সমর্থক সিরহানের ভাল লাগেনি কেনেডির উগ্র ইজরায়েল প্রীতি, তাই আমেরিকার সর্বময় কর্তৃত্ব কেনেডির হাতে যাওয়ার সম্ভাবনাকে ,২২ বোরের খাটো নলা আইভর জনসন রিভলভারের সাহায্যে বাতিল করে দিলেন সিরহান বি সিরহান। কেনেডির প্রতি এতই ছিল তাঁর ঘৃণা যে পরবর্তীকালে তাঁর বলতে বাধেনি, 'ওই বেজন্মাটা বুলেটের যোগ্য নয়!'

জাঁ পল মারার হত্যাকারি শারলটে করডে থেকে সিরহান বিশারা সিরহান – কেউই তাঁদের কৃতকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ

রবারট কেনেডি

প্রকাশ করেননি। বরং প্রত্যেকেই গর্বিত ছিলেন একটা মহৎ কাজের সংগে নিজের নাম যুক্ত করতে পেরে।

জন উইলকিনস বুথ-এর ডায়েরিতে পাওয়া গিয়েছিল এই কয়েকটি কথা, 'আমার দেশের সমস্ত দুঃখের জন্য দায়ী এই লোকটা (লিংকন)। ভগবান আমাকে তৈরি করেছিলেন লিংকনকে শাস্তি দেবার জন্য।' ভগবানদত্ত সে দায়িত্ব পালন করার পর বুথের শেষ কথা ছিল, 'মা'কে বল, আমি দেশের জন্য প্রাণ দিলাম।' গুইতো এবং প্রাংক-এর কথাতেও ঘুরেফিরে এসেছে ভগবানের প্রসংগ। অন্যদিকে চোলগস ঘোষণা করেছিলেন, 'দেশের মংগলের জন্য প্রেসিডেনটকে হত্যা করাটাই আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয়েছিল।'

সিরহান এখনও জেলে বন্দী। এতদিনে তাঁর পূর্ব-মানসিকতার কোন পরিবর্তন ঘটেছে বলে শোনা যায়নি।

দুই কেনেডি ও মারটিন লুথার কিং ছাড়াও ষাটের দশকে আরো দুটি গুপ্তহত্যা গুরুত্ব পেয়েছিল। ক্যাস্ত্রোর চিরশত্রু ডমিনিকান রিপাবলিকের ডিকটেটর র‍্যাফায়েল লিও-নিদাস ত্রুজিললো মলিনা ব্যস্ত ছিলেন ক্যাস্ত্রো হত্যার পরিকল্পনায়। হয়ত একটু বেশিই ব্যস্ত ছিলেন। নাহলে দেশের ভেতর গড়ে ওঠা অন্তর্দ্বন্দ্বে যে তিনি নিজেই নিহত হতে পারেন সেটা আঁচ করতে পারলেন না কেন এই ঝানু ডিকটেটর? ১৯৬১-র ৩০ মে নিহত হন ত্রুজিললো, অন্যদিকে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফরিকার প্রধানমন্ত্রী হনরিক এফ ভেরউড নিজের অফিসেই আততায়ীর ছুরিতে নিহত হন ১৯৬৬-র ৬ সেপটেমবর।

আনোয়ার সাদাত

ওই গোটা সময়টা ধরে চেষ্টা চলেছিল ক্যাস্ত্রো হত্যার। বাদ যাননি দ্য গল কিংবা লিনডন বি জনসনও। পরের দলকেও,মারকিন প্রেসিডেনট নিকসন ও ফোরডকেও দাঁড়াতে হয়েছিল পরীক্ষার মুখে। আর ১৯৮১-তে রেগন হত্যা চেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল সেই পুরনো অভ্যেস থেকে এই আশির দশকেও মুক্ত হতে পারেনি আমেরিকা। এর কিছুদিন পরেই আক্রান্ত হয়েছিলেন পোপ জন পল। আততায়ী মেহমেদ আলি আগকা ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রমাণ করেন যে স্বয়ং পোপও নিরাপদ নন। পোপ রক্ষা পেলেও ভাগ্য ভাল ছিল না মিশরের প্রবল প্রতাপশালী আনোয়ার সাদাতের। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া সাদাত আশির দশকের আততায়ীদের সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

চলতি বছরের অকটোবর মাসে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। ভাগ্য ভাল তাঁর – কোন অঘটন ঘটেনি।

কিন্তু অবশেষে ঐ অকটোবরেই ৩১ তারিখের এক মনোরম সকালে নিজস্ব রক্ষী বাহিনীর ১৬টি গুলি রক্তাক্ত করে দিল ভারতের অবিসংবাদিত নেত্রী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শরীর। হাজার চেষ্টাতেও তাঁকে বাঁচান সম্ভব হয়নি।

যত সহজ ছিল লিংকন কিংবা গারফিলডকে হত্যা করা, ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে তা। জোরদার হয়ে উঠছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। হিটলারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তো বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। জনসমক্ষে স্তালিনকে দেখা ছিল এক বিরল ঘটনা। জন কেনেডি হয়ত বেঁচে যেতেন যদি নিরাপদ স্থান ভেবে ডালেস-এ তাঁর গাড়ির কাঁচের ঢাকনাটি সরিয়ে না নেওয়া হত। রেগন হত্যা প্রচেষ্টার পর 'নিউজউইক' পত্রিকার একটি রিপোরট থেকে জানা যায় বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রনায়কদের কীভাবে প্রতিটা পদক্ষেপ মেপে চলাফেরা করতে হয়। প্রহরী পরিবেষ্টিত ফ্রানসের প্রেসিডেনটের মোটরবাহিনীর পিছনে পিছনে চলে ডাকতার সহ একটি অ্যামবুলেনস। সন্ত্রাসবাদীদের আতংকে পশ্চিম জারমানির রাষ্ট্রপ্রধানকে ঘিরে থাকে পিস্তল, মেশিনগান ও গ্রেনেড সহ অভিজ্ঞ রক্ষী বাহিনী। রুশ নেতাদের গতিবিধি থাকে গোপন, কোন কাগজেই ছাপান হয় না তা। দক্ষিণ আফরিকার প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে থাকে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত রক্ষীরা। অন্যদিকে জাপানে আততায়ীদের প্রধান অস্ত্র খাটো তরোয়াল বলে নিরাপত্তা বাহিনীর কুংফু-কারাটে সহ মারশাল আরটস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিকিউরিটি পুলিশ পাহারা দেয় প্রধান-মন্ত্রীকে। তুলনামূলকভাবে মারগারেট থ্যাচারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক শিথিল।

কিন্তু সত্যিই কি এ ব্যবস্থা নিরাপত্তার কোন গ্যারানটি দেয়? আততায়ীরাও তো সময়ের সংগে সংগে শিক্ষিত হয়ে উঠছে। লিংকন ও কেনেডি হত্যার পদ্ধতি এক ছিল না। এই একশ বছরে দু পক্ষই শিক্ষা নিয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। খোদ রেগনকেই আড়াল করা যায়নি, অজানা ছিদ্র দিয়ে ঢুকে আসা সাপ বিষে নীল করে দিয়েছে সাদাতের গোটা শরীর। যতই বন্ধ করা হোক না ছিদ্রগুলি, নতুন নতুন ছিদ্র আবিষ্কারের ক্ষমতা আততায়ীদের আছে। আশির দশকে হয়ত সে পথেই হেঁটে আসবে আধুনিক বুথ, গুইতো কিংবা কালগসরা। □

জয় দাশগুপ্ত

আলোকচিত্র : সংগৃহীত

আজ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে

রঙ ফর্সা করার ক্রীম ক্লীয়ার·টোন আপনাকে দেবে-এক নতুন রূপ!

১ম সপ্তাহ

মাত্র তিন দিন পরে, সত্যিসত্যিই আমার চামড়া নরম হতে শুরু করেছে!

২য় সপ্তাহ

আমার বান্ধবী বলেছিল, আমার রঙে নাকি 'জৌলুষ' দেখা দিয়েছে!

৩য় সপ্তাহ

আমার পুরোণো ব্রণর দাগগুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করেছিল! ওঃ সে কি আরাম!

৪র্থ সপ্তাহ

এমনকি খরখরে কনুইও বেশ মোলায়েম হয়ে গিয়েছিল—মাত্র তিন হপ্তা ক্লীয়ার·টোন মেখে!

৫ম সপ্তাহ

আশ্চর্য্য! রোদ্দুরে ঘুরছি অথচ কালো হচ্ছি না!

৬ষ্ঠ সপ্তাহ

আমি তো এখন যাকে বলে ক্লীয়ার·টোনের ফ্যান! আমাকে ফর্সা রাখার জন্যে ও কি করছে দেখুন!

ক্লীয়ার·টোনের অদ্বিতীয় ফরমূলা মৃদু আর স্বাভাবিকভাবে আপনার ত্বক আরো উজ্জ্বল, আরো ফর্সা করে তোলে। শুধু তাই নয়। **ক্লীয়ার·টোনের** এক অনন্য উপাদান ত্বকের কুৎসিৎ দাগ আর খুঁত দূর করে দেয়। এর সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই আপনার রঙরূপ এমন উজ্জ্বল আর কোমল করে তোলে, যা নজরে পড়ে। নিয়মিত রোজ দুবার করে **ক্লীয়ার·টোন** মাখতে থাকুন—তাহলে কি রোদে কি ঘরে, এর সুফল বজায় থাকবে চিরতরে!

ক্লীয়ার·টোন

লণ্ডন • প্যারীস • নিউ ইয়র্ক

ফর্সা রঙের রহস্য, কাজ করে স্বাভাবিকভাবে!

daCunha/NICL/36/84/BN

ধর্মীয় রাজনীতিই কি ভারতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তুলছে না?

স্বাধীন ভারত সংবিধানগতভাবে ও রাষ্ট্রিক-ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। নানা ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণ তাঁদের নিজস্ব ধর্মাচারের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা এখানে ভোগ করেন। ভারতীয়রা নিজের ধর্ম সম্বন্ধে অতি-মাত্রায় সচেতন। এই কারণে আজ যে প্রশ্নটা বড় স্পষ্ট ও ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হল ভারতবাসী হয়ে আমাদের আনুগত্য কার প্রতি বেশি থাকবে – নিজের সার্বভৌম দেশ ভারতবর্ষ, নাকি নিজের ধর্মবোধ? রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় ভরা আছে এর অসংখ্য নজির। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বসে ভারতের মত এক উদার সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় দেশে এই সংঘাত আজ যে নবরূপে দেখা দিচ্ছে, তা গভীরভাবে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ কী? এই প্রশ্নটাও আজ অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই প্রশ্নের বিচারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা আসবে।

আমাদের নিজেদের কাছে ও পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাদের প্রধান পরিচয় হবে কিসের ভিত্তিতে – আমরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করি, না কোন ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের বসবাসকারী কোন জাতি হিসেবে? উত্তর নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক ভাবে দ্বিতীয়টির সপক্ষে যাবে – অর্থাৎ আমাদের প্রধান পরিচয় আমরা ভারতীয়।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের কী পরিচয় সে কথা ছেড়ে দিলে এবার যে প্রসঙ্গে আসতে হয় তা হল অভ্যন্তরীণভাবে অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে আমাদের নিজেদের কী পরিচয়? সেই পরিচয়ের প্রশ্ন নির্ধারিত হয় আমাদের ভাষার মাধ্যমে। অর্থাৎ বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা বাঙালি, তামিল যাদের মাতৃভাষা তারা তামিল, মারাঠা যাদের মাতৃভাষা তারা মারাঠি ইত্যাদি। পরিচয়ের শেষ পর্বে আসে (না আসলেও কোন ক্ষতি নেই) ধর্ম বিশ্বাসের প্রশ্ন। অর্থাৎ কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খৃস্টান, কে জৈন, কে বৌদ্ধ বা কে শিখ ইত্যাদি। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে নিজেদের আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণভাবে পরিচিত হবার ক্ষেত্রে ধর্মের স্থান সব চাইতে শেষে ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সব চাইতে কমজোরী।

পরিচয় পর্বের দিক দিয়ে ধর্মের স্থান সব চাইতে শেষে হলেও মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। ধর্ম বিশ্বাস এমনই একটি জিনিস যা যুগ যুগ ধরে আমাদের মজ্জায় মিশে গিয়ে আমাদের অবচেতন মনকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং যার প্রভাব চেতন মনের ওপরে নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গেই এসেছে ধর্মীয় সংস্কার ও আচরণবিধি যেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিবিচারের কষ্টিপাথরে ধোপে টেকে না। প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের ওপর কোন আঘাত বা সংশয় বোধ আমরা মেনে নিতে পারি না – হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ধর্ম সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতনতার ফলে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের ধর্মের মহত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টার জন্যে পারস্পরিক মানব-সম্পর্ক বিদ্বেষ, তিক্ততা ও কলহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য লড়াইয়ে যত রক্তপাত ঘটেছে, ধর্মের কারণে যুদ্ধের জন্য রক্তপাতের পরিমাণ তার চাইতে কম নয়।

কোন ধর্ম মতই অন্যান্য ধর্ম মতকে হেয় বা অবজ্ঞা না করে চলায় বিশ্বাসী হলেও বিভিন্ন মতের অনুগামীরা তাদের নিজেদের মত সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন ও সংবেদনশীল হওয়ার ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এই সংঘাত চলে আসছে।

রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে কী সম্পর্ক হওয়া উচিত তা নিয়ে বহু কথা আগেও হয়ে গেছে এখনও হচ্ছে। মধ্যযুগে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে যে প্রচণ্ড সংঘাত ছিল, আজ তা বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এর কারণস্বরূপ বলা যায় যে কালাতিক্রমণ, শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি, যুক্তিবাদের ক্রমাধিপত্য আধুনিক মানুষের বুদ্ধি ও চিত্তকে একটা উচ্চস্তরে – বৈজ্ঞানিক মননে ও সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই আধুনিকীকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে বহু ধর্মীয় প্রচলিত বিশ্বাস আজ কুসংস্কার বলে বর্জিত হয়েছে, যুক্তিবাদ ও শিক্ষা মনকে করে তুলেছে যুক্তিনিষ্ঠ ও উদার। আজ পাশ্চাত্যে মানুষের পরিচয়ের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে সে কোন ধর্মে বিশ্বাস করে তা নয়, সে কোন রাষ্ট্রে বাস করে তাই। ইউরোপের কথা উঠল এই কারণে যে ওখানেই আধুনিক যুক্তিবাদের (rationalism) জন্ম হয়েছিল। ওখানেই ঘটেছিল শিল্প বিপ্লব যার ফলস্বরূপ ঘটেছে জাগতিক (material) সভ্যতার চরম বিকাশ। জাতীয়তাবাদই সেখানে মূলমন্ত্র – ধর্মীয় বিভক্তির জিগির নয়। আমাদের দেশের সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চাইতে ভিন্নতর তা মানি। কিন্তু পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রবেশও তো পশ্চিমমুখো খোলা জানলা দিয়ে প্রায় গত দুশ বছর ধরেই ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যযুগীয় অচলায়তনের মধ্যে ঘটেছিল। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল আমরা পেয়েছি প্রচুর। পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু ভাল দিক আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছি – নিয়েছি আধুনিক শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক মতবাদ, যুক্তিবাদ ইত্যাদি। পরিতাপের বিষয়, এই নব ভাবধারায় মূলত ভারতীয় সমাজের যে অংশ সব চাইতে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল তা হিন্দু সমাজ। অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষত মুসলমান সমাজ গোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রবেশ ছিল ক্ষীণতর। হিন্দুধর্ম সহিষ্ণুতায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ। যে কেউ, তা তিনি ভারতীয় হন বা বিদেশিই হন, হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে নানা তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও আমরা নীরব থাকি ও থেকেছি। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় ও ধর্ম বিশ্বাসে যতখানি বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে ততখানি আর কোথাও লক্ষ্য করা যায়নি। বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম বিশ্বাস হিসেবে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে শত শত বছর সহবাস করেও হিন্দু ধর্ম তার সহিষ্ণুতা গুণটি ভারতে অবস্থানকারী অন্যান্য ধর্মগুলির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেনি।

হিন্দু ধর্মের শিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মধ্যে, ধর্মের অবস্থান হচ্ছে নিজের মনের ভেতরে। আমার ধর্মবিশ্বাস একান্তভাবে আমারই – সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই। বিশ্বে প্রধানত ও প্রথমত আমার পরিচয়, আমি ভারতের নাগরিক এবং সে সম্পর্ক এমন ইস্পাত-কঠিন

ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে অন্য কোন কিছুর মূল্যেও, এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল্যেও, তার সংগে কোন আপস হওয়া সম্ভব নয়। ভারতের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি আমার আনুগত্য অসীম ও সংশয়াতীত। পৃথিবীর যে কোন আধুনিক উন্নত জাতির মধ্যেই নিজ নিজ রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই চেতনারই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। অপর দিকে ধর্মের স্বাভাবিক স্থান মন্দিরে, মসজিদে, গুরুদ্বারে, মঠে ও সর্বোপরি মানুষের মনের অন্তস্তলে। সেখান থেকে তাকে বার করে এনে বৃহত্তর রাজনীতির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করলে কোন ধর্মই কি পবিত্র থাকে – ধর্ম থাকে? ধর্মের এই অবনমনের সম্ভাবনা ধর্মানুরাগী প্রত্যেকটি মানুষেরই, তা তিনি যে ধর্মেই বিশ্বাস করুন না কেন, শংকার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশে ধর্মের নামে যা খুশি তাই প্রায় করা যায়। ধর্ম ধীরে ধীরে এক শানিত রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠছে যাতে যে কোন চিন্তাশীল মানুষই উদ্বেগ বোধ করবেন। একেই আমাদের দেশ দরিদ্র, শিক্ষার প্রসার সম্যকভাবে ঘটেনি। একথা অবিসংবাদী সত্য যে অশিক্ষা ও দারিদ্র-ফলিত মনের ওপর ধর্মের প্রভাব সব চাইতে বেশি থাকবে। শিক্ষার অভাব মানুষকে যুক্তি বুদ্ধির পথ থেকে সরিয়ে রাখে ও মানুষ আবেগসর্বস্ব প্রাণীতে পরিণত হয়। এই পরিবেশে রাজনীতি যদি ধর্ম-নির্ভর হয়ে পড়ে তবে তার ফলাফল হয়ে উঠবে শোচনীয় এবং নিশ্চিত ফলস্বরূপ ভারতের সংহতির বিনাশ হবে অনিবার্য।

এই প্রসংগে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টিও এসে পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় যে রাষ্ট্র কোন ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মাচরণ করবার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবেন। কিন্তু আক্ষেপের কথা হচ্ছে এই যে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির এক বিকৃত ব্যাখ্যায় বহু সংখ্যক জনসাধারণ আজ চালিত হচ্ছেন। ধর্মের নামে যা খুশি করবার অধিকার সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির দ্বারা নিশ্চয়ই দেওয়া হয়নি। ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবার, রক্তপাত ঘটাবার, ধর্মীয় স্থানকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করবার ও সর্বোপরি ভারতের সামগ্রিক সংহতি বিনাশ পেতে পারে, এমন কিছু করবার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে কিছু ধর্মীয় নেতা তাঁদের রাজনৈতিক উচ্চাশাকে চরিতার্থ করবার জন্যে অশিক্ষিত জনসাধারণের সংবেদনশীল ধর্মবোধকে আশ্রয় করে তাদের বিপথে পরিচালিত করছেন। এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে তাঁদের যতটা না, তার চাইতে অনেক বেশি সামগ্রিকভাবে ভারতের।

প্রসংগত পাঞ্জাবের কথা ও অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের কথা এসে পড়বেই। স্বর্ণমন্দিরের এই দুঃখজনক পরিস্থিতি আমাদের আরও সজাগ করে তুলেছে সংবিধানের

ইন্দিরার ছবি নিয়ে শোকার্ত মিছিল

ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টির প্রতি। পাঞ্জাব সম্পর্কে প্রথম কথা হচ্ছে যে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তিতে অভ্যুত্থান। এর ফলাফল যে কী ভয়ানক হতে পারে তার রক্তাক্ত সাক্ষ্য আজ পাঞ্জাব। শিখদের পরম পবিত্র ধর্মীয় স্থান স্বর্ণমন্দির যে ক্রমে একটা নিরেট সশস্ত্র দুর্গে পরিণত হয়েছিল তাতে আজ কারোরই সংশয় নেই। মন্দিরের মধ্যে যে অজস্র রক্তপাত ঘটেছে নিজেদের নিছক রাজনৈতিক দলাদলিতে তাও আজ সবার জানা। প্রশ্ন হচ্ছে এই মন্দিরকে দুর্গে রূপান্তরিত করা এবং মন্দিরের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রক্তপাত ঘটানর ফলেই কি মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হয়নি? অকালি দলের কার্যকলাপের মধ্যে কি জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হবার আশংকা দেখা দেয়নি? এক গোষ্ঠীর ধর্মের নামে অপর গোষ্ঠীর লোকেদের বেপরোয়া হত্যার মধ্যে কি ধর্মবোধ কলঙ্কিত হয়নি? সেক্ষেত্রে অধার্মিক আচরণের জন্যে যে পবিত্র স্থান অপবিত্র হয়েছে ইতোমধ্যেই, সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে স্বর্ণমন্দির থেকে উগ্রপন্থীদের জোর করে বার করে দিয়ে মন্দিরের স্বাভাবিক অবস্থা ও তথাকথিত পবিত্রতা ফিরিয়ে আনবার পেছনে কি কোন সমালোচনার অবকাশ আছে? পাঞ্জাবের সামগ্রিক পরিস্থিতি কি ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির প্রয়োগের আওতায় আসে? জানি স্বর্ণমন্দিরের এই পরিণতি সবার কাছেই দুঃখজনক, বিশেষত ধর্মভীরু শিখদের কাছে তো বটেই। কিন্তু এবার কি বসে ভাববার সময় হয়নি যে কেন এমন হল বা কী করলে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব রোধ করা সম্ভব? আজ মন্দিরে সৈন্য প্রবেশ আমাদের প্রচলিত অভ্যাস বা ধারণাকে ধাক্কা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে এই জাতীয় চরম পদক্ষেপ ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ও এর সুফল পাবার আশা আছে। কথাটা বলছি এ কারণে যে এরপর কোন ধর্মগোষ্ঠীই ধর্মস্থানকে দুর্ভেদ্য বা রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রবেশ-অধিকার-বহির্ভূত বলে মনে করবে না। দ্বিতীয়ত স্বর্ণমন্দিরের মত ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা কমে আসবে। প্রসংগত মনে পড়ছে যে, ৫০ ও ৬০-এর দশকে ছাত্রদের ধারণা ছিল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ প্রবেশ করলে তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে বহু ছাত্র আন্দোলনে দেখেছি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাড়িগুলো আন্দোলনকারী ছাত্ররা দুর্গের মত ব্যবহার করত। কিন্তু একবার যখন পুলিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রীতি ভেঙে প্রবেশ করে, তখন প্রতিবাদ যদিও হয়েছিল প্রচুর, কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সংগে সংগেই পুলিশের এই অধিকার আমরা মেনে নিয়েছি। আজ তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আর দুর্গের মত ব্যবহৃত হয় না।

ভারতে ধর্মীয় রাজনীতির কথা আলোচনা করতে বসলে আরও নানা ধর্মগোষ্ঠীর কথা প্রাসংগিকভাবেই এসে পড়ে। সংখ্যালঘু এমন কিছু ধর্ম সম্প্রদায় এখানে আছে যাদের ধর্মসচেতনতা অতি উগ্র আর ধর্মের ব্যাপারে জংগী মনোভাবও সুবিদিত। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ধর্ম রাজনীতির বিষটি আরও জটিল হয়ে পড়েছে। স্বর্ণমন্দিরের ঘটনাটি যদি কোন সংখ্যালঘু ধর্মস্থানকে কেন্দ্র না করে কোন হিন্দু মন্দিরকে কেন্দ্র করে ঘটত তবে আজ থেকে বহু মাস আগেই কি সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটত না? এ কথা সুবিদিত যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চাইতে সংখ্যালঘু শিখ ও ইসলামপন্থীরা অনেক বেশি ধর্মীয় জংগী মনোভাবের জন্য খ্যাত। সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকার হিসেবে সংখ্যালঘুদের দিকটা অধিক সহানুভূতির সংগে এখানে বিবেচিত হয়। এছাড়া আরও একটি কথা আছে। শিখদের ধর্মীয় আবেগকে সামান্য আঘাত করার আগে সরকারকে আরও অনেক দিক বিবেচনা করতে হয়, যেমন বিশেষত আমাদের সেনাবাহিনীর দিকটি। শিখ সৈন্যে পুষ্ট সেনাবাহিনীর এক অংশের প্রতিক্রিয়ার দিকটিকেও বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই বিবেচনার দিক শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ নয়, আন্তর্জাতিকভাবে সুবিস্তৃত। আন্তর্জাতিক ইসলামবাদ (pan Islamism)-এর ফলে ইসলাম সম্বন্ধে যে কোন প্রশাসনমূলক ব্যবস্থা – যা মুসলমান স্বার্থ-বিরোধী মনে হতে পারে – তা রাষ্ট্রের যত বিশেষ প্রয়োজনেই হোক না কেন, সারা বিশ্বে তার এক বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। ফলে সরকারকে অনেক বেশি বিবেচনা করে চলতে হয়। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভক্ত মুসলমান এখানে যে সুযোগ-সুবিধে লাভ করে তা কি সমস্ত তথাকথিত ইসলাম রাষ্ট্রে পাওয়া যায়? 'শিয়া' সম্প্রদায়ের ইসলাম রাষ্ট্র ইরানে 'সুন্নি' বা অন্য সম্প্রদায়ের মুসলমানরা কি একই রকম সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে? প্রতিবেশি পাকিস্তানে 'আহমেদিয়া' গোষ্ঠী কি খুবই সুখে আছে?

মারকসবাদে ধর্ম অস্বীকৃত। রাষ্ট্রীয় প্রয়োগে সমাজবাদী দেশও ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু কোন সমাজবাদী দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্যে বিভিন্ন রকম আইনের

অধিষ্ঠান দেখা যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর মুসলমান আছেন। সেখানে তাদের স্বধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে কি আলাদা আইন চালু আছে? আন্তর্জাতিক ইসলামবাদের প্রয়োগও সেখানে দেখা যায় না। সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদের পরিচয় অনুগত রুশ জাতীয়তাবাদী নাগরিক হিসেবে – ধর্মীয় পরিচয়ের মূল্য সেখানে নেই। তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানরা কি রাষ্ট্রের স্বার্থকেই প্রথম বিবেচনা করে কোরান-বিরুদ্ধ কোন কাজ করেছে যাতে তাদের বিধর্মী বা ধর্মচ্যুত বলা যায়? তা নিশ্চয়ই নয়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংস্রব কখনও কোন সুফল আনতে পারে না, কোথাও আনেনি। তথাকথিত আন্তর্জাতিক ইসলামবাদের ভিত্তিও যে কত দুর্বল তা আজ দুই ইসলাম রাষ্ট্র ইরান-ইরাকের যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

স্বভাবতই মনে আসে যে ধর্মে অবিশ্বাসী সোভিয়েত রাশিয়ায় যা সম্ভব হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতে তা কেন অসম্ভব হবে? অকারণ তো কোন কার্য হয় না। কাজেই এর পেছনে যে মানসিকতা বা যে ভুল ত্রুটিগুলো হয়েছে তার আলোচনা দরকার। একথা জানা যে, দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে পরিকল্পনা-মাফিক জিইয়ে রাখা হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে। এখন বৃটিশ নেই, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধির মধ্যে সেই সংস্কার উত্তরাধিকাররূপে বেঁচে আছে। তাকে সমূলে উৎপাটনের জন্যে কোন অকৃত্রিম প্রচেষ্টা হয়নি। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নীতি নিয়েছে কংগ্রেস প্রথম থেকে। বোধ হয় এর মূলে একটি গভীরতর মনস্তত্ত্ব আছে কংগ্রেসের, কারণ, ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি সূত্রে ভারত বিভাগ মেনে নিয়েও কংগ্রেস ভারতে দ্বিজাতি সূত্র মানেনি। স্বল্প সংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে আশ্বস্ত করতে, বেশি কাছে টানতে, পরিণামে তা তোষণে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ ও বাম রাজনীতির সকল পন্থাই নির্বাচনে তাৎক্ষণিক ফল লাভের আশায় প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়েছেন পরোক্ষে। কোনও দলই কি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় নীতিগত ভাবে অমুসলমান প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন – বা উল্টোটা? এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ভুল করেছেন কমিউনিসট বন্ধুরা। ধর্ম-সম্পর্ক-শূন্য আর্থিক সংস্রব ঘটার সমাজনীতির ওপর নির্ভরশীল মারকসবাদী দল নির্বাচনে যোগ দেবার প্রথম থেকেই মুসলমান-গরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাবার নীতি নিলেন কেন? এতো সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে কিস্তি দেওয়া। প্রথম নির্বাচনে তখন তারা বিপ্লবী দল – নির্বাচনে হারজিৎকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন না, ভুয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে কোন মোহ ছিল না। আজ অবশ্য তা পারা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন এই রাজনৈতিক কাঠামোতে তারা একটা উল্লেখযোগ্য শক্তি, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনের শীর্ষে। তবে গোড়াতে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসারে কংগ্রেসের যে আত্মম্ভরিজাত ভুল হয়েছে, তার চাইতে বহু গুণ ভুল ও ক্ষতি করেছেন কমিউনিসট দল তাৎক্ষণিক নির্বাচনে মুনাফা লুটতে গিয়ে। তাই নয় কি? ক্ষণেকের সুস্থ আত্মবিশ্লেষণই এই বক্তব্যের যাথার্থ প্রমাণে সক্ষম হবে।

আরও মজার কথা এই যে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ কোন বামপন্থী নেতা যখন বলেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লব না হলে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয় – তখন তার মধ্যে অসহায় বিহ্বলতা ছাড়াও পলায়নী মনোবৃত্তির দুর্বলতা স্পষ্ট হয়। সামগ্রিক সামাজিক উন্নতিতে গণতন্ত্রের গতি মন্থর, কিন্তু প্রগতিশীল। পরাধীন ভারতে উনবিংশ শতকে যে সামাজিক ও ধর্মীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল – সতীদাহ নিষেধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নদীতে শিশু বিসর্জন নিরোধ ইত্যাদি – তা কেমন করে? শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। বিপুল বাধাকে অতিক্রম করে তখন যা সম্ভব হয়েছিল – এখন তা হচ্ছে না কেন? ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কবে হবে বা আদৌ হবে কিনা না ভেবে এই কাঠামোয় – গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তা করা অসম্ভব কেন – তা কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না।

পাড়ায় পাড়ায় শহীদ বেদী। আলোকচিত্র : শংকর নাগ দাস

এ প্রসঙ্গে জনমানসিকতার পরিবর্তনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বহুদিনের সৃষ্ট মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে দরকার শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মানসিকতাকে পরিবর্তিত করা। শুধু আইন করেই সব কিছু করা যায় না – তার প্রমাণ, পণপ্রথা, জাতিভেদ প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করা সত্ত্বেও তা নির্মূল করা যায়নি। তার কারণ জনসাধারণের মানসিকতার পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করা হয়নি। তাই এবার উচিত হবে উল্টো পথে হাঁটা – অর্থাৎ জনমানসিকতার পরিবর্তন ঘটানর চেষ্টা করা।

ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে আরও একটি সর্বনাশা অশুভ সংকেত ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে আঞ্চলিক দলগুলির অভ্যুত্থানে। সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এই বহু ভাষা-ধর্ম বলে সম্মিলিত ভারতীয় গণতন্ত্রে একটি ক্যানসার বা কর্কট রোগের মত মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে। দেশ বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত হয়ে যাবার আশংকা আছে। একথা সত্য যে বহু ক্ষেত্রেই ক্ষমতা লাভ ও ক্ষোভ সৃষ্টির পেছনে বৃহত্তর বিশ্ব-রাজনৈতিক শক্তিগুলির সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী হস্তক্ষেপ থাকে, কিন্তু তাকে সংযত ও প্রতিহত করার মত নেতৃত্ব কেন ভারতে প্রস্তুত হবে না?

এ পরিস্থিতিতে জাতির ঐক্য ও সংহতিকে আরও শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করবার প্রশ্নে কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কথা ভেবে দেখা যায়। তাতে ধর্মীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি প্রতিহত করা সম্ভব হবে। প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রচার ও প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক ও ধর্মীয় রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার বিলুপ্ত করা। তৃতীয়ত, সকল আইনই ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নিরপেক্ষভাবে সকল ভারতীয়ের প্রতি প্রয়োগ করা। চতুর্থত, ভারতীয়গণের প্রথম আনুগত্য সার্বভৌম ভারতের প্রতি – ধর্ম-ভাষা বা অন্য মতাদর্শের প্রতি নয় এটি সুস্পষ্ট করা। আর এগুলিকে শীর্ষস্থান দিয়ে সরকারী দল ও বিরোধী দলের, তথা বাম-দক্ষিণ যাবতীয় দলের, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মিলিত চেষ্টাতে শিক্ষা প্রসারের জন্যে, সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্যে, বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক ভাবধারা প্রচারের জন্যে বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করা, নানা প্রতিক্রিয়াশীল ও তাৎক্ষণিক ফললাভের মনোবৃত্তির ফাঁদে পা না দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে, বিশ্বমানব সমাজে ভারতের স্থান ও অবদানকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে এখনই এই মহাকর্মের সূত্রপাত ঘটান দরকার। □

অসীমপদ চক্রবর্তী

মর্মান্তিক খবরে মসকো মর্মাহত

মসকো থেকে চিরঞ্জীব

৩১ তারিখ সকাল ৯টা ৫ মিনিটে (ভারতীয় সময় ১১টা ৩৫ মিনিট) টেলিফোন বেজে উঠল। এক বাঙালির কণ্ঠ – 'একটা দুঃসংবাদ আছে। বি বি সি এক্ষুনি জানাল ইন্দিরা গান্ধী দিললিতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আজ সকালে, তাঁর অবস্থা সংকটজনক।'

বিশ্বাস করতে পারিনি। পাশের ঘরে দ্রুত গিয়ে পরিবর্তনের প্রধান উপদেষ্টা অশোক চৌধুরীকে খবরটা জানাতে উনিও হতভম্ব। কীভাবে পরবর্তী খবর পাওয়া যায়। মসকোয় আমাদের দূতাবাস কি জানে? কিংবা সোভিয়েত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ? ভাষা তেমন বুঝি না, তবুও মসকো রেডিও বা টিভি খুললাম। খবর পেলাম না। ইতোমধ্যে স্থানীয় বাঙালিদের সকলেই খবর পেয়ে গিয়েছেন। খবর জানেন রুশীরাও। সকলেই উৎকণ্ঠিত, সকলেরই জিজ্ঞাসা, উনি ভাল আছেন তো?

এক ঘণ্টা পরে বি বি সি-র ওয়ারলড নিউজ একই কথা জানাল, ইন্দিরা গুলিবিদ্ধ, তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, মৃত্যুর সংগে লড়ছেন। পুত্র রাজীব পশ্চিমবংগ সফর বাতিল করে দিললি গিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-ও বিদেশ সফর ছোট করে দিললি রওনা হয়েছেন।

আমরা সকলেই প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। রেডিওর যত স্টেশন ধরা যায়, চেষ্টা করছি। দিললিও পাওয়া যাচ্ছে না।

স্থির ছিল – ৩১ অকটোবর মাঝ রাতের বিমানে আমরা কলকাতা ফিরব। তার আগে মসকোর কিছু সাংবাদিক ও 'সোভিয়েতসকি সয়ুজ' কর্তৃপক্ষের সংগে আমাদের নৈশ ভোজ। কিন্তু সকালে ইন্দিরা গান্ধীর সংকটজনক অবস্থার খবর শুনে ওঁরা জানান, যদি কিছু অঘটন ঘটে তবে রাতের অনুষ্ঠান বাতিল করতে হবে।

১১টায় আবার বি বি সি ধরলাম। সেই একই খবর। কিন্তু খবর শেষ করার আগের মুহূর্তে পি টি আইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান হল - পি টি আই জানিয়েছে – ইন্দিরা গান্ধী আর ইহলোকে নেই।

আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি।

ক্রেমলিন, ভারতীয় দূতাবাস সকলেই এই মর্মান্তিক খবর জেনে গিয়েছে। দুঃসংবাদ বোধহয় দ্রুতই ছড়ায়।

দুপুরে গেলাম 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' ও 'স্পোরট ইন ইউ এস এস আর' পত্রিকা অফিসে। ওঁরা আমাকে দেখছেন আর মুখ নিচু করছেন। কী বলবেন, কী বলে দুঃখ ও সমবেদনা জানাবেন বুঝতে পারছেন না। সোভিয়েত ইউনিয়ন পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক কনোডলি ও স্পোরট ইন ইউ এস এস আর-এর নির্বাহী সম্পাদক ওলেগ স্পাসকি বললেন, সোভিয়েত দেশ একজন মহান বন্ধুকে হারাল। আমরা এই মর্মান্তিক খবর এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

ওঁদের সংগে দেখা করে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। এক বৃদ্ধা পিছন পিছন আসছিলেন। কী বললেন বুঝিনি। সংগী হিতাংশু দাশগুপ্ত জানালেন, উনি তোমাকে দেখে বুঝেছেন তুমি ভারতীয়। তাই ইন্দিরা গান্ধীর জন্য সমবেদনা জানালেন।

এরপর একটি স্কুলে গিয়েছিলাম একজনের সংগে দেখা করতে। ভিজিটারস রুমে বসে আছি। ছাত্রদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অনেকেই সেখানে। সকলেই রুশি। 'আপনি কি ভারতীয়?' 'হ্যাঁ' বলতেই ওঁরা কেউ কেউ মাথা নিচু করলেন। কেউ কেউ বললেন, তুমি কি জান 'ইন্তিরা গান্ধী' নেই!

সরকারি দৈনিক 'ইজভেসতিয়া' বের হয় দুপুর দুটোয়। বিকালে আরও কয়েকটি দৈনিক বের হয়। তাই একটি কিয়স্কে গেলাম খবরের কাগজ কিনতে। বিরাট লাইন। হাতে সময় বেশি নেই। আমার সংগী এক রুশি ফটোগ্রাফার ওঁদের বললেন, ইনি ভারতীয়। সকলে আমাকে আগে গিয়ে কাগজ কেনার সুযোগ দিলেন। প্রত্যেকেই আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। কিয়স্কের ভারপ্রাপ্ত বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে ক্রশ আঁকলেন ডান হাতে, আর উচ্চারণ করলেন 'ইন্তিরা'। উনি চোখের জল সামলাতে পারেননি। আমিও চোখ মুছলাম। এবার হাত ধরে যা তিনি বললেন, তার অর্থ আমরা আছি তোমাদের সংগে। জানালেন, আমি জওহরলাল, লালবাহাদুর, ইন্তিরা তিন প্রিমিয়ার মিনিসটারকেই দেখেছি।

ইজভেসতিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে খবর দিয়েছে শেষ মুহূর্তে ছবিসহ।

ফিরে শুনলাম সন্ধ্যা সওয়া সাতটায় মসকো টিভি ইন্দিরাজীর খবর বলেছে অনেকক্ষণ ধরে। তবে রেডিও মাঝে মাঝেই খবর দিচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন টিভির চারটি চ্যানেলেই রাত ৯টার 'প্যানোরামায়'

আন্তর্জাতিক খবর দেয় সারা দেশের দর্শক-শ্রোতাদের জন্য।

প্যানোরামা অনুষ্ঠানে ৯টায় প্রথম খবর – তিন মহাকাশচারীকে রাষ্ট্রপতি চেরনেনকো পুরস্কার দিলেন 'হিরো অব সোভিয়েত ইউনিয়ন'-এর। তারপর প্রায় দুই মিনিট টিভি নিস্তব্ধ। শুধু আসতানকিনো টিভি টাওয়ারটি দেখান হচ্ছে।

এবার কালো পোশাকে সংবাদ পাঠক (মৃতদের প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা জানাবার এটাই এঁদের রীতি) এলেন। অত্যন্ত বেদনাহত কণ্ঠে জানালেন – ইনডিসকির প্রিমিয়ার মিনিসটার ইন্তিরা গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা। প্রথম ঘোষণার পরেই ভেসে উঠল টি ভি-র পুরো পর্দা জুড়ে তার সদাহাস্যময় ছবিটি। ছবির দুপাশে মোটা কালো বরডার। বলা হল তিনি সোভিয়েত জনগণের কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বলা হল নিপীড়িত মানবজাতির জন্য কত কাজ করেছেন। বলা হল জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির পুরোধা রূপে কী কাজ করেছেন। বলা হল, তিনি ভারত বা এশিয়ার শুধু নেত্রী নন, ছিলেন বিশ্বনেত্রী। বলা হল সোভিয়েত সরকার, কমিউনিসট পারটি এবং সোভিয়েত জনগণ তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে মর্মাহত, শোকে সন্তপ্ত, প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর। বলা হল, তিনি আজ থেকে অনুপস্থিত। কিন্তু আমরা তাঁকে, তাঁর কাজকে কখনও ভুলব না। তারপর আবার ওঁর ছবি অনেকক্ষণ ধরে এবং আস্তে আস্তে সেই ছবি অন্তর্হিত হল।

সংবাদ-পাঠকের কথার ফাঁকে দেখান হল দিললির হাসপাতালের সামনে তাঁর জন্য ক্রন্দনরতদের বিলাপ, দিললির নানা স্থানে গভীর বেদনার চিত্র।

প্যানোরামায় দ্বিতীয় এই ১০ মিনিটের পুরোটাই ছিল ইন্দিরার খবর ও তাঁকে ঘিরে গভীর শ্রদ্ধা।

প্যানোরামার আগে এই খবর যাঁদের অজানা ছিল, তাঁরাও ইন্দিরার খবর জানলেন। এদেশের অন্যত্রর খবর জানি না, কিন্তু মসকোয় বেরিয়ে দেখি সর্বত্র বিষাদের চিত্র। রাত্রে আমাদের বিদায় জানাতে এলেন কয়েকজন রুশি। আমরা ভারতীয়রা কী বলব ওঁদের! আজ সোভিয়েত নাগরিকরা যেন ইন্দিরা সম্পর্কে আরও বেশি জানেন, ওঁরা বোধহয় আমাদের চাইতে অনেক অনেক বেদনাহত, অনেক শোকার্ত।

বিমান বন্দরের দিকে রওনা হওয়ার আগে এক রুশি মহিলা টেলিফোনে দাসভোদানিয়া জানালেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন। ইন্দিরাজী সম্পর্কে কয়েকটি পংক্তি ইংরাজিতে বললেন, বললেন সেই গানটির কথা, বাংলায় সেটি –

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি, তাও হয়নি হারা।

নিখুঁত সুন্দরটা মনে যখন জানা

ঘরেতেই সেটা শুরু করুন বোনা !

কথাটা ঠিক কিনা ? মনে মনে জানেন তো,
কোনটা নিখুঁত বানাতে চান।
যার ধারেকাছে কোনও রেডিমেড ঘেঁষতেই
পারবে না। আর মনের মত নিখুঁতটি
বুনতে রেমণ্ড'স নিটিং ইয়ার্ণ তো চ-ম-ৎ-কা-র !
এমন সব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ও
রঙের শোভা, যা সবারই মনোলোভা।

একমাত্র রেমণ্ড'স নিটিং ইয়ার্ণ-ই
পাওয়া যায় ১৪৬-টি রকমের মোলায়েম,উষ্ণ,
ফুলোফুলো, চমৎকার রঙের বাহারে।
যা দিয়ে এমন জিনিসটি করবেন তৈরি...
যা দেখে সব্বাই বলবে আহামরি...আহামরি !

রেমণ্ড

নিটিং ইয়ার্ণ

সুন্দর বুননে সাজানো
সংসার সাজানো-গোছানো!

আপনার অধিকার, আপনার কর্তব্য (৪)

গ্রেপ্তার করার নিয়ম- কানুন

এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, পুলিশ কি কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেনট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে? একজন সাধারণ মানুষ কি পারে কোন দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে?

কোন অপরাধের তদন্তকার্য চালাবার সময় পুলিশের দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সন্দেহজনক অপরাধীকে খুঁজে বের করা ও তাকে গ্রেপ্তার করা। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশকে তা আইন মেনে সতর্কভাবেই করতে হয়। ওয়ারেনট জারি করে অথবা ওয়ারেনট ছাড়াই পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে। যখন পুলিশ ওয়ারেনট বলে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তখন সাধারণত কোনরকম ভুল বোঝা-বুঝির কারণ ঘটে না। ওয়ারেনটেই গ্রেপ্তার করার সব কারণ বর্ণনা করা থাকে। কিন্তু ওয়ারেনট ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলেই ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়। যে ব্যক্তিকে ওয়ারেনট ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হয় তিনি ভাবেন এটা তাঁর স্বাধীনতার ওপরই হস্তক্ষেপ করা হল। কাজেই আমাদের এখানে আলোচনা করে জানা উচিত যে, কখন একজন মানুষকে পুলিশ ওয়ারেনট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী পুলিশ ওয়ারেনট ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে। এই ৪১ নম্বর ধারা ছাড়াও আইনের আরো অনেক ধারায় ওয়ারেনট ছাড়াই যাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে তার কথা বলা আছে। পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধগুলির সূত্র খুঁজে বের করতে এবং তা রোধ করতে পুলিশ যাতে আরো তৎপরভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১ নম্বর ধারায় পুলিশের ওপর অগাধ ক্ষমতা ন্যস্ত করা আছে। অনেক সময় এমন অনেক অপরাধ সংঘটিত হয় যখন পুলিশের হাতে আর সময় থাকে না যে তারা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে ওয়ারেনট সংগ্রহ করে তারপর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবে। কাজেই পুলিশকে ওয়ারেনট ছাড়া গ্রেপ্তার করার মত অগাধ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। তবে কোর্ট-ও সবসময় কড়া দৃষ্টি রেখে চলেছে যাতে পুলিশ কখনও এই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে। ওয়ারেনট ছাড়া গ্রেপ্তার করার ব্যাপারটি কখনও পুলিশ অফিসারদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে না। এই সব গ্রেপ্তার পর্ব কঠোরভাবে আইন মেনে সমাধা করতে হয়। একজন মানুষকে গ্রেপ্তার করার আগে গ্রেপ্তার করার সপক্ষে পুলিশকে যথেষ্ট কারণ দেখাতে হবে। গ্রেপ্তারের অর্থ হচ্ছে একজন মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করা। কাজেই, পুলিশকে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোন নিরপরাধ মানুষের ওপর কোন অবিচার করা না হয়। একজন মানুষের বিরুদ্ধে কোন পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধের অভিযোগ যেন ভ্রান্তিবশত আনা না হয়। কাজেই যখনই পুলিশ ওয়ারেনট ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে যাবে তখন তার পেছনে যথেষ্ট কারণ থাকা চাই।

পুলিশ কখনও কখনও ওয়ারেনট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে, এই কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পুলিশের এই ক্ষমতাটি অবাধ। কিন্তু তাই বলে সাধারণ জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ব্যবহার করা যায় না। তবে যদি মনে করা হয় অপরাধী পালিয়ে যেতে পারে তাহলে ঐসব অপরাধের ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা খুবই দরকারি যে, কোন অবস্থাতেই একজন পুলিশ অফিসার কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার আগে আটক রাখতে পারেন না। পুলিশ তাকে নজরে রাখতে পারে এবং পরে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। কিন্তু পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করতে চাইছে তাকে গ্রেপ্তার করার আগে তার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণবিধি পুলিশ আরোপ করতে পারে না।

আইন যেহেতু পুলিশের ওপর এই অগাধ ক্ষমতা দিয়েছে তাই পুলিশেরও উচিত খুব সংযতভাবে এই ক্ষমতা ব্যবহার করা। যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হবে, যদি দেখা যায় সেই ব্যক্তি কোন পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত আছে এরকম সন্দেহ করার বা ভাবার পেছনে যথেষ্ট কোন কারণ নেই তাহলে ঐ গ্রেপ্তার বে-আইনি হয়ে যাবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী পুলিশকে যে অগাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যদি দেখা যায় পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অযৌক্তিকভাবে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, তাহলে ভারতীয় দন্ডবিধির ২২০ নম্বর ধারা অনুযায়ী পুলিশ শাস্তিযোগ্য বলে পরিগণিত হবে। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার আগে তার পেছনে কতগুলো কারণ থাকা চাই। এই কারণগুলো হল – (ক) যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হবে তার কোন পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধে জড়িত থাকা বা এ সম্পর্কে পুলিশের হাতে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ কোন অভিযোগ থাকা, (খ) যাকে গ্রেপ্তার করা হবে সে কোন পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত আছে এরকম সন্দেহ করার পেছনে যথেষ্ট কারণ থাকা, কিন্তু মিথ্যা কোন সন্দেহ না করা, (গ) যাকে গ্রেপ্তার করা হবে সে যে পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত সে সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র যোগাড় করা, (ঘ) অন্য কারোর মতামতের ওপরে নির্ভর না করে নিজ দায়িত্বে এবং বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা।

এবার দেখা যাক কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ কোনরকম ওয়ারেনট ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

(ক) যখন কোন ব্যক্তি কোন পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকবে অথবা তার বিরুদ্ধে কোন পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধের যথাযথ অভিযোগ থাকবে তখন পুলিশ তাকে ওয়ারেনট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারবে। অথবা যদি কোন ব্যক্তি পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত আছে বলে পুলিশের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া কোন খবর থাকে বা তাকে সন্দেহ করার মত যথাযথ কোন কারণ থাকে তাহলেও পুলিশ কোনরকম ওয়ারেনট ছাড়াই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

(খ) যদি কোন ব্যক্তির কাছে বাড়িতে সিঁদ কাটার কোনরকম যন্ত্রপাতি থাকে তাহলে তাকেও কোনরকম ওয়ারেনট ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে।

(গ) আইনের দৃষ্টিতে যখন কোন ব্যক্তি অপরাধী বলে পরিগণিত হবে তখন তাকে কোনরকম ওয়ারেনট ছাড়া পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে।

(ঘ) যার কাছে কোনরকম চোরাই দ্রব্য থাকবে বা কোন চোরাই দ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে যাকে অপরাধী সন্দেহ করার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে তাকে কোনরকম ওয়ারেনট ছাড়াই গ্রেপ্তার করা চলবে।

(ঙ) যে ব্যক্তি পুলিশ অফিসারের তদন্তকার্যে বাধা দেবে অথবা পুলিশ হেপাজত থেকে পালিয়ে যাবে বা পালাবার চেষ্টা করবে তাকেও ওয়ারেনট ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে।

(চ) সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা কোন ব্যক্তিকেও পুলিশ ওয়ারেনট ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারবে।

(ছ) যদি কোন ভারতীয় ভারতের বাইরে এমন কোন অপরাধ করে যা সে ভারতের মাটিতে করলে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হত, তাহলে তাকেও পুলিশ কোনরকম ওয়ারেনট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারবে।

(জ) মুক্তিপ্রাপ্ত কোন অপরাধী যদি আবার কোনরকমভাবে আইন-ভঙ্গ করে তাহলে তাকেও পুলিশ ওয়ারেনট ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারবে।

(ঝ) একজন পুলিশ অফিসার লিখিত অথবা মৌখিকভাবে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার অনুরোধ জানালে অন্য আরেকজন পুলিশ অফিসার সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তবে ঐ অনুরোধে কাকে গ্রেপ্তার করা হবে তা যেমন পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া উচিত তেমনই কী কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত। ঐ অনুরোধ অনুযায়ী যে পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার করতে যাবেন তিনি এটাই ধরে নেবেন যে, যে পুলিশ অফিসার এই অনুরোধ করেছেন তিনি ঐ ব্যক্তিকে কোনরকম ওয়ারেনট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারতেন।

এছাড়াও, ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৯ এবং ১১০ ধারার একটি অথবা একাধিক বর্ণনার ভেতর যে ব্যক্তি পড়বে তাকে থানার অফিসার ইনচারজ গ্রেপ্তার করতে অথবা গ্রেপ্তার করাতে পারবেন। ফৌজদারি কার্যবিধির এই দুটি ধারায় সন্দেহজনক ব্যক্তি এবং পেশাদারী অপরাধীদের আচার আচরণ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে।

এসব ছাড়াও আরো কয়েকটি কারণে পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তাও এখানে বলা হল।

কোন পুলিশ অফিসারের উপ-

স্থিতিতে যদি কোন ব্যক্তি পুলিশ-গ্রাহ্য নয় এমন কোন অপরাধ করে থাকে তবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

কোন ব্যক্তি পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। অথবা পুলিশ অফিসার জানতে চাইলে যদি কোন ব্যক্তি নাম-ঠিকানা জানাতে না চায় বা ভুল নাম-ঠিকানা জানায় তাহলেও তাকে পুলিশ ইচ্ছে করলে গ্রেপ্তার করতে পারে। এখানে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নাম-ঠিকানাটি সঠিকভাবে জানা। সঠিক নাম-ঠিকানা জানা হয়ে গেলে সেই ব্যক্তিকে সাধারণ বনড-এ বা হাজিরা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিসহ বনড-এ সই করিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু যদি গ্রেপ্তার করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই ব্যক্তির নাম-ঠিকানা জানতে না পারা যায় বা বনড-এ সই না করে অথবা নিজের সপক্ষে যথেষ্ট সিওরিটি না দেখায় তাহলে তাকে নিকটস্থ কোন বিচার-ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিসট্রেটের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।

কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির নাম-ঠিকানা আগে থেকেই পুলিশের জানা থাকে তাহলে তাকে কোনমতেই আটক রাখা অথবা গ্রেপ্তার করা যাবে না। মাঝে মাঝে পুলিশের কাছে ভারতে অবস্থিত কোন কোন বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে ঐ বিদেশি নাগরিকের বনড-এ এক অথবা একাধিক ভারতীয়কে সিওরিটি হিসেবে থাকতে হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২ নম্বর ধারায় একথা বলা আছে।

এবার আসা যাক আলোচনার আরেকটি পর্বে। কোন সাধারণ নাগরিক কি কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে? কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারে। তা এখানে বলা হল।

(ক) যদি কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে অপর কোন ব্যক্তি পুলিশ-গ্রাহ্য ও জামিনযোগ্য নয় এমন কোন অপরাধ করে থাকে তবে যে ব্যক্তি উপস্থিত আছেন তিনি অপরাধী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

(খ) যে ব্যক্তি একজন ঘোষিত অপরাধী তাকেও একজন সাধারণ নাগরিক গ্রেপ্তার করতে পারে।

গ্রেপ্তার করার পর ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দিতে অযথা দেরি করা চলবে না। যদি সেই সময় পুলিশ অফিসারকে ধারে কাছে না পাওয়া যায় তবে ধৃত ব্যক্তিকে যেসব সাধারণ নাগরিকরা আটক করেছেন তাঁরা নিকটস্থ কোন থানার হেপাজতে দিয়ে আসবেন। তখন ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী পুলিশ অফিসার ঐ ধৃত ব্যক্তিকে পুনর্বার গ্রেপ্তার করবেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩ নম্বর ধারায় একজন সাধারণ নাগরিকের একজন অপরাধীকে ধরার ক্ষমতা দেওয়া আছে। শুধু তাই নয়, তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও ঐ ধারায় দেওয়া আছে। ধরিয়ে দেওয়া বলতে বোঝান হয়েছে যে, একজন সাধারণ নাগরিক অন্যান্য ব্যক্তির সাহায্যে অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পারেন। একজন সাধারণ নাগরিক অন্যান্য ব্যক্তির সাহায্যে নিকটস্থ থানায় অপরাধীকে নিয়ে যেতে পারেন।

যদি পুলিশ অফিসার মনে করেন যে ব্যক্তিকে সাধারণ নাগরিকরা আটক করেছেন তাকে অপরাধী ভাববার পেছনে যথেষ্ট কোন কারণ নেই, তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী পুলিশ অফিসার ধৃত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিতে পারেন।

প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে আইন রক্ষকদের কাজে সাহায্য করা। এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই সাধারণ নাগরিকদের হাতে অপরাধীকে ধরার ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছেন তাঁকে সবসময়ই মনে রাখতে হবে যদি অপরাধী তাঁর সামনে কোন অপরাধ করে থাকে তবেই একমাত্র তিনিই ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। যদি অপরাধ আগেই সংঘটিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের কর্তব্য। একজন সাধারণ নাগরিক তখন শুধু পুলিশকে এ বিষয়ে খবরাখবর দিয়ে সজাগ করতে পারেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩ নম্বর ধারায় একথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। □

উপেন বিশ্বাস

মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১ নভেম্বর ১৯৮৪ সংখ্যা

আমেরিকায় মেয়েরা কি কেবল আনন্দের সামগ্রী?

আমেরিকার সমাজজীবনে, রাজনীতিতে মেয়েদের ভূমিকা আশানুরূপ নয়। সেই তুলনায় ভারতের মহিলারা অনেক সক্রিয়। আমেরিকা প্রবাসী নীতা মজুমদার তারই তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এই নিবন্ধে।

গ্রামের মেয়েদের জীবন ও জীবিকা

গ্রামের মেয়েরা আজ অনেকেই স্বনির্ভর। এদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে এই প্রতিবেদনটি লিখেছেন স্বর্ণলতা মিত্র ঘোষ।

খেলার মাঠে মেয়েরা পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে?

ওলিম্পিকসে মেয়েদের অগ্রগতি খুব দ্রুত। তাঁরা নানা ইভেন্টে নামছেন। কিন্তু মেয়েরা কি কখনও পুরুষদের রেকর্ড ছুঁতে বা অতিক্রম করতে পারবেন? বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানে প্রবন্ধটি লিখেছেন প্রদীপ দে।

সম্বলহীনা প্রাচীনা

শেষ জীবনে সম্বলহীনা মহিলাদের দুর্ভোগের শেষ নেই। তাঁদেরই সামাজিক ও মানসিক অবস্থার ওপর চিত্রা মৈত্রের এক আন্তরিক আলোচনা।

চাকুরে মেয়েদের মা হওয়ার সমস্যা

চাকুরে মেয়েদের সন্তান প্রসবে সমস্যা অনেক। সেই সমস্যার বিভিন্ন দিক ও কারণ নিয়ে মিলনরানী বিশ্বাসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।

সাক্ষাৎকার : নন্দিতা সেন।। প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়
উপন্যাস : শ্বেতকরবী।। সত্যেন্দ্র আচার্য
গল্প : নিজের ধাঁধা।। মানসী দাশগুপ্ত

দীপঙ্কর যেখানে দাঁড়িয়ে

অভিনেতা দীপঙ্কর দে-র ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুজয় সোম।

মীনাক্ষী শেষাদ্রি : সর্বোচ্চ স্থান দখলই একমাত্র সাধনা

হিন্দি সিনেমার নতুন অভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রির সঙ্গে জ্যোতি ভেঙ্কটেশের সহৃদয় আলোচনা।

এছাড়া : ফ্যাশন, রান্না, রূপচর্চা, সেলাই, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য, গৃহসজ্জা, চিকিৎসা, আগামী দিনের শিল্পী, গান ও স্বরলিপি, যাত্রা ও রাশিফল।

৬৪ পাতার বই। ঝকঝকে ছাপা। দাম : সাড়ে তিন টাকা

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

ধর্ম

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ- পরিক্রমা-৩৮

অধরলাল সেনের বাড়ি

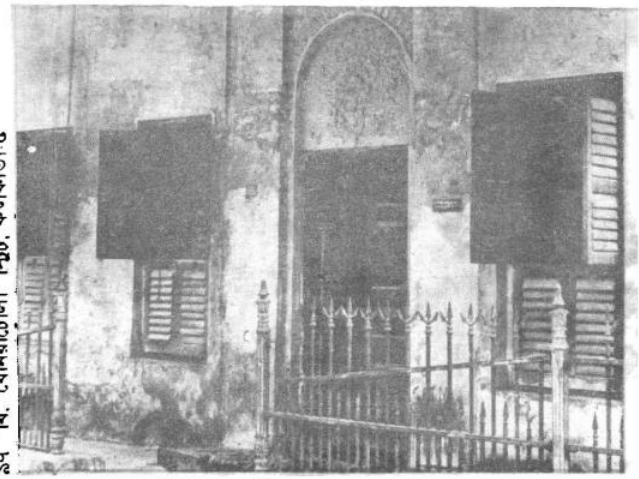

৯৭ বি. বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, কলকাতা-৫

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, একনিষ্ঠ ভক্ত অধরলাল সেনের উত্তর কলকাতার শোভাবাজারে বেনেটোলার বাড়িতে বহুবার ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। অধরলাল খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ইংরাজি সাহিত্যে 'ডাফ স্কলারশিপ' পেয়েছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ডেপুটি ম্যাজিসট্রেটের চাকরি গ্রহণ করায়, তৎকালীন অপর ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। অধরলাল প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকালটি অব আরটস'-এর সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরে ভারত সরকার কর্তৃক 'ফেলো' মনোনীত হন। কবি হিসাবেও প্রথম জীবন থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হয় এবং 'ললিতা-সুন্দরী', 'মেনকা', 'নলিনী', 'কুসুমকানন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এই সব কাজে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং প্রায়ই ঠাকুরকে নিজ বাড়িতে এনে আনন্দোৎসব করতেন। অধরলালের বাড়ির দুর্গোৎসবেও ঠাকুর যোগদান করতেন এবং তাঁর বাড়ির দোতলার বৈঠকখানায় বহু ভক্তের সঙ্গে মিলিত হতেন। এই বাড়িতেই একদা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের অপূর্ব যোগাযোগের ঘটনায় জানা যায় : "আজ ঠাকুর অধরের বাড়িতে আসিয়াছেন।....শনিবার ইংরাজী ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।....ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময় অধর কয়েকটি বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন। অধর (বঙ্কিমকে দেখাইয়া ঠাকুরের প্রতি) — 'মহাশয়, ইনি ভারী পন্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। ইঁহার নাম বঙ্কিমবাবু।' শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — 'বঙ্কিম ! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!' বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে) — 'আর মহাশয় ! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।" ইত্যাদি।.... "শ্রীরামকৃষ্ণ – (বঙ্কিমের প্রতি) আচ্ছা, আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি?' বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে) — আজ্ঞা তা যদি বলেন, তা হলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।' শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — 'এঃ ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া! তুমি যা রাতদিন করো, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায়, তার ঢেঁকুর ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেঁকুর ওঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো, আর ঐ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে।" ইত্যাদি। (কথামৃত ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট – ক) বলা আবশ্যক, গুণগ্রাহী বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের এই তিরস্কারে কোন দোষ ধরেননি এবং তাঁদের মধ্যে পরে যথারীতি ধর্মালোচনাও হয়েছিল আন্তরিকতাসহ। এই বাড়িতেই এক উৎসবে ঠাকুরের সঙ্গে যোগদান করে ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী সুবর্ণবণিকের বাড়িতে নিজে ব্রাহ্মণ-সন্তান হিসেবে আহার গ্রহণের আপত্তি করেন, কিন্তু ভক্তের জাতিভেদ ভুলে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন, তখন কেদারনাথও তাঁর সঙ্গে আহার করে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান। একদা এই বাড়িতেই অধরলালের জিহ্বায় ঠাকুর কিছু লিখে তাঁকে বিশেষ কৃপা করেন এবং দিব্যানন্দের আস্বাদ দান করেন প্রকৃতপক্ষে এককালে ঠাকুরের নৃত্যগীতে এই বাড়িটি যেমন মুখরিত ছিল, ভাবসমাধির মাধুরিমায় পূর্ণ ছিল, আবার তেমন নানাবিধ আধ্যাত্মিক আলোচনার স্পর্শে বৈকুণ্ঠের রূপ ধারণ করেছিল। 'কথামৃত'-গ্রন্থে অধরলালের বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমনের কয়েকটি দিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা :– ২.৬.১৮৮৩ (৫ম ভাগ, ষষ্ঠ খন্ড); ১৪.৭.১৮৮৩ (৫ম ভাগ, সপ্তম খন্ড); ২১.৭.১৮৮৩ (৩য় ভাগ, ৪র্থ খন্ড); ১৮.৮.১৮৮৩ (৫ম ভাগ,সপ্তম খন্ড); ১০.১০.১৮৮৩ (৫ম ভাগ, দশম খন্ড), ৬.৯.১৮৮৪ (৪র্থ ভাগ, সপ্তদশ খন্ড); ২৯.৯.১৮৮৪ (২য় ভাগ, সপ্তদশ খন্ড); ১.১০.১৮৮৪ (২য় ভাগ, অষ্টাদশ খন্ড) এবং ৬.১২.১৮৮৪ (৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট – ক)।

বাড়ির ঠিকানা : ৯৭ বি, বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, শোভাবাজার, কলিকাতা ৫; পূর্বে এই বাড়ির নং ছিল "৯৭," বাড়িটি বিভক্ত হবার পর এই নতুন নমবর হয়। তিনতলা প্রাচীন বাড়িটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং দক্ষিণমুখী। বাড়ির সামনের একতলার রোয়াকটি লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। বাড়িতে প্রবেশ করে সামনে উঠান এবং ঠাকুর-দালান। এই দালানেই দুর্গোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, দুর্গোৎসব এখনও হয়, কালীপূজাও হয়। দোতলার হলঘরের বৈঠকখানাটির মাঝখানে দেওয়াল তুলে বর্তমানে দুটি শয়ন ঘর করা হয়েছে। দোতলার হলঘরেই ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মিলিত হতেন। অধরলালের এই বাড়িটি ছিল পৈতৃক। অধরলালের কোন পুত্র ছিল না – ৪টি কন্যা ছিল, এখন সবাই মৃত। অধরলালেরা ছিলেন ছয় ভাই; ছোটভাই হীরালাল সেনের তিনজন প্রপৌত্র (কালিদাস, ডাঃ দুর্গাদাস ও চন্ডীদাস) বর্তমানে এই বাড়িতে বাস করেন।

পথনির্দেশ : উত্তর কলকাতার চিৎপুর রোড (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণি) থেকে পশ্চিমমুখী রাস্তা শোভাবাজার স্ট্রিটে ঢুকে একটু এগিয়ে গেলে বামদিকে বিখ্যাত বি কে পালের বাড়ি ও ডাক্তারখানা। এটি ছাড়িয়ে গেলেই বামদিকে বারোয়ারীতলা লেন, এই লেনে ঢুকে সামান্য এগুলেই বেনিয়াটোলা স্ট্রিট পড়বে। এই স্ট্রিটে এসে ডানদিকে বেঁকে ৩/৪ খানি বাড়ির পরই ডানদিকে '৯৭বি' নমবর বাড়ি। □

নির্মলকুমার রায়

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য রায়

লজ্জা-সংকোচের কারণে রোগ লুকাবেন না

বিবাহিত জীবনের পূর্ন আনন্দ নিন

লজ্জা সংকোচের দরুণ নিজ দুবলতা গোপন করে দাম্পত্য সুখ নষ্ট করবেন না। আজই আপনার সমস্ত রোগের বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন। আয়ুর্বেদীয় মহান গ্রন্থে দেওয়া শক্তিশালী ফর্মূলার দ্বারা আপনিও বিবাহিত জীবনকে সুখময় করে বাস্তবিক আনন্দ নিন। পত্র ব্যবহার গোপন রাখা হয়।

NATH AYURVEDASHRAM
P.O. KATRI SARAI (GAYA)

ধবল বা শ্বেতীর চিকিৎসা

শীঘ্র প্রভাবশালী চিকিৎসার সন্ধান

বহু বৎসরের পরিশ্রমে সাদা দাগের সহস্রাধিক রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করে আমরা প্রচুর প্রশংসাপত্র লাভ করেছি। এই ওষুধ এতই শক্তিশালী যে শুরু থেকেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে। দাগ বিলুপ্ত হবে না বলে যাঁরা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁদের রোগমুক্ত করা হইয়াছে। হাজার হাজার ব্যক্তি ফল লাভ করেছেন এবং নিত্য করছেন। সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে থাকলে অন্ততঃ একবার এটি পরীক্ষা করে দেখুন। প্রচারার্থে বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন।

চিকিৎসা যে কেউ করতে পারে, ফল দেখে বিশ্বাস করবেন।

NATH AYURVEDASHRAM,
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

মলটোভা দল সবাইকে অবাক ক'রল

সেদিন ছিল মলটোভা দলের ছোট্ট মিনির জন্মদিনের পার্টি। পরদিন সকালে দলবল বাগানে বসে জন্মদিনের কেকের টুকরোর সঙ্গে গরম-গরম মলটোভা খেতে-খেতে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। কেকটা কি বিরাট আর কি সুন্দরই না ছিল। পুরো চকোলেট দিয়ে মোড়া কেকের ওপর ছোট্ট-ছোট্ট রঙীন মোমবাতি বসানো কেকটা মিনিকে উপহার দেবার সময় কি দারুণ মজাই না লাগছিল। মিনির টেবিলটা সুন্দর সুন্দর উপহারে বোঝাই হয়ে গেছল। কিন্তু, এতসব সত্ত্বেও ছোট্ট মিনি কেন এত মনমরা?

"আরে, আমাদের ছোট্ট মিনির কি হয়েছে?

মিনি আস্তে আস্তে বলল, "ডাব্বু,অনাথ আশ্রমের ধীরুকে মনে আছে তো? গতকাল মা ধীরুকে আমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন করেছিল। জানিস ভাই, জন্মদিনের পার্টি তো, ও কখনো দেখেনি। আর সামনের শনিবার ওর জন্মদিন। কিন্তু, অনাথ আশ্রমে ওর জন্যে কেইবা আর জন্মদিন করতে যাবে! বেচারা! বলতে বলতে মিনির চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে কান্না উপ্‌ছে পড়ল। শুনে সবার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সকলেই চুপ করে ভাবতে লাগল, সত্যিই ধীরু বলে ছোট্ট ছেলেটা কি সুন্দর। কিন্তু, ওর মুখে কখনো হাসি দেখা যায়নি।

সেলিমের মাথায় একটা দারুণ মতলব এল ...

সেলিম মিটিমিটি হাসতে হাসতে দলবলের কাছে ওর গোপন মতলবটা খুলে বলল। আচ্ছা, ওরা যদি ধীরুর জন্মদিনে একটা পার্টি দেয় তো, কেমন হয়? ধীরু নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। শুনে সকলের কি উৎসাহ, সত্যিই-সত্যিই আইডিয়াটা দারুণ! চটপট্ ঠিক হয়ে গেল কে কি দেবে ... ডাব্বু পকেট খরচার জমানো টাকা দেবে; বেনু মাকে দিয়ে একটা সুন্দর কেক বানিয়ে দেবে; এইভাবে মালতি, সেলিম...সকলেই যে যা পারবে দেবে। মিনি সোৎসাহে বলল, ওর জন্মদিনে পাওয়া উপহার থেকে অনেক কিছু দেবে। গোপনে এই পার্টি দেয়ার ব্যাপারে, পুরো দলটারই কি উৎসাহ।

ধীরুর অপেক্ষায়...এক দারুণ বিস্ময়!

ঐ শনিবার ধীরুকে সেলিমের বাড়ি নেমন্তন্ন করা হ'ল। ওকে আগে কেউ কিছু না বলাতে, ও কিছুই বুঝতে পারেনি। ওকে খুব দুঃখি-দুঃখি দেখাচ্ছিল। ধীরু আস্তে আস্তে কড়া নাড়তেই দরজা আপনা-আপনি খুলে গেল। "তোমরা ভাই কোথায়?"... কিন্তু ঘর অন্ধকার। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল আর কোরাসে শোনা গেল...'হ্যাপি বার্থডে... ধীরু অবাক হয়ে দেখে তার চারপাশে ওর অনাথ আশ্রমের সঙ্গীর দল আর মলটোভা দল মিলে হাত তালি দিয়ে গান গাইছে। আর একটা বড়সড় গোলাপী-সাদা কেক সুন্দর করে টেবিলে সাজানো রয়েছে। সারা ঘরে রঙীন বেলুন টাঙ্গানো। তারপর, কেকের সঙ্গে গরম-গরম মলটোভা খেতে খেতে ধীরুর জন্মদিনের পার্টি দারুণ জমে উঠল। ধীরু কত কি উপহার পেল। দেখে-শুনে ধীরুর চোখে আনন্দে জল এসে গেল। সে মনে মনে বলল মলটোভা দল...অজস্র ধন্যবাদ!

চমৎকার মলটোভা, যারজন্যে সবেতে মজা আর মজা

আজ্ঞে হ্যাঁ, মলটোভায় বাড়ন্ত বাচ্চার দল, প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল। কারণ, প্রতি কাপ মলটোভায় থাকে, সোনালী দানার গম, বার্লি, খাঁটি দুধ, পুষ্টিকর কোকো আর চিনির ভরপুর গুণ। বাচ্চাদের নিয়মিত মলটোভা দিন আর দেখুন, ওরা কেমন বাড়তি প্রাণ-প্রাচুর্যে, রোগ প্রতিরোধের বাড়তি ক্ষমতা আর দারুণ স্ট্যামিনা নিয়ে সবল স্বাস্থ্যে তরতরিয়ে বাড়তে থাকে।

ভিটামিনের বিশেষ গুণে ভরপুর

মলটোভা হ'ল প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে তৈরী এক চমৎকার খাদ্য, যা নিয়াসিন, ভিটামিন A, B_1 ও D_2-এর বাড়তি গুণেও ভরপুর। এতে কৃত্রিম স্বাদ-গন্ধের কোনরূপ বালাই নেই। মলটোভা...আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাদের প্রাণ-প্রাচুর্যের খনি।

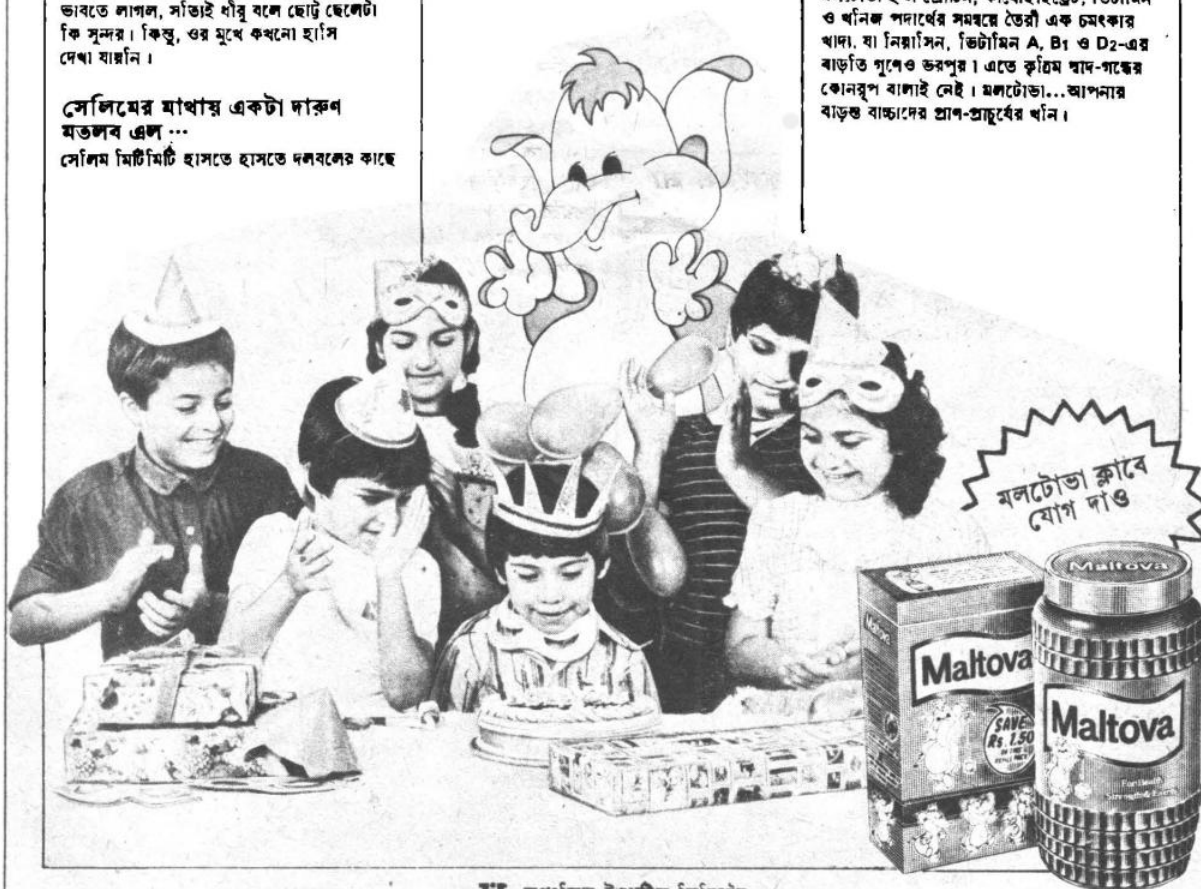

JIL জগৎজিত ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

ভিটামিনে ভরপুর মলটোভা: স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের জন্যে

SIMOES/JIL/002/84 BEN

স্মৃতির ইন্দিরাঃ ইন্দিরার স্মৃতি

'বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়' – ভাঙা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধী তখন আর প্রধানমন্ত্রী নন – ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তখন তিনি ক্ষমতাচ্যুত। ১৯৭৮ সালের ২১ আগস্ট দিল্লি গেলাম তাঁর বিশেষ সাক্ষাৎকার নিতে। তখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ছেড়ে ১২ নং ওয়েলিংডন ক্রিসেনটের বাসিন্দা।

বললাম, আপনি তো আর প্রধানমন্ত্রী নন। রাজনীতির স্বর্গ থেকে মর্তে পতন ঘটেছে। সারা দেশে এখন সমালোচনার ঝড়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে আপনাকে নিয়ে নানা কুৎসা প্রচার চলছে। 'শাহ কমিশন' বসিয়ে আপনার মানসম্ভ্রম খাটো করতে নানা প্রয়াস চলছে। যাঁরা ছিলেন আপনার নিকট সহচর তাঁরাও এই দুর্দিনে আপনাকে ছেড়ে চলে গেছেন। এই চরম মুহূর্তে গুরু-দেবের সেই বিখ্যাত কবিতা – 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি ....' একবারও মনে পড়ে কি?

শ্রীমতী গান্ধী হাসলেন স্মিত হাসি। বললেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরুদেব। তাঁর সব কবিতাই আমার ভাল লাগে। তবে এই চরম মুহূর্তে আমার বেশি করে মনে পড়ছে :

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি
ভয়। ....

বললেন, কোনও বিপদে আমি ভীত নই। আমার জীবনে ভয়ের কোন স্থান নেই। বিপদ জয়ের মধ্যেই তো জীবন জয়ের আনন্দ। গুরুদেবের এই মর্মবাণী আমার কর্মজীবনের সব উৎসাহ আর উদ্দীপনার উৎস।

: আপনি তো প্রথম জীবনের কিছু অংশ শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন। কাছে থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছেন। রাজনৈতিক পরিবেশে যখন আপনি ক্লান্ত-অবসন্ন হন, তখন কি একবারও শান্তিনিকেতন অথবা কবিগুরুর কথা মনে পড়ে?

বুঝলাম, রাজনৈতিক নেত্রী হয়েও তিনি এই মুহূর্তে রাজনীতির বাইরের আলোচনায় বেশি আগ্রহী। বললেন, তোমার এই ছোট্ট প্রশ্ন আমাকে আমার অতীত জীবনের এক মধুময় স্মৃতি রোমন্থনে সাহায্য করছে। সে এক স্মৃতিময় যুগ। গুরুদেব শুধুমাত্র একজন মহান কবি, দেশপ্রেমিক, দার্শনিক কিংবা সংগঠক নন, বিশ্বের তিনি এক মহাপুরুষ। তাঁর মধ্যে আমরা বিশ্বমানবের সামগ্রিক চিন্তার রূপ খুঁজে পাই। বিশ্ব পরিবারের তিনি এক আদর্শ পিতাস্বরূপ। আমরা যদি তাঁর মহান আদর্শে উদ্দীপ্ত হতে পারি, তবে সকল ক্ষুদ্রতা, নীচতা আর সংকীর্ণতা জয় করতে পারি। সবরকম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে মানবসেবার সফল পূজারী হতে পারি।

গুরুদেব আর শান্তিনিকেতনের স্মৃতি রোমন্থনে যখন তিনি মগ্ন – সেই মুহূর্তে দিল্লির আকাশ ভেঙে অঝোর ধারায় বর্ষণ শুরু হল। সংগে মেঘের ঘন গর্জন। শ্রীমতী গান্ধী এক ঝলক বাইরে দৃষ্টি রাখলেন। প্রশান্তিময় চোখ ফিরিয়ে এনে বললেন, এটা জল-ঝড়ের মরশুম নয়। অথচ দেখ, কবিগুরু আর শান্তিনিকেতন নিয়ে আলোচনা শুরু করতেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি আর অসময়ের এই হালকা বর্ষণকে কী উজ্জ্বল করে তুলেছে পড়ন্ত রোদের রক্তিম আভা!

শ্রীমতী গান্ধীর আবেগ তখন বুঝি আর বাধ মানে না। বললেন, তখনকার শান্তিনিকেতন ছিল সত্য সত্যই শান্তির নীড়। যেন পটে আঁকা ছবি। গুরুদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শান্তিনিকেতনে এক অনির্বচনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ছোটবড় আমরা সকলেই এক পরিবারভুক্ত ছিলাম। গুরুদেব ব্যক্তিগতভাবে প্রায় সকলেরই খোঁজখবর নিতেন। এছাড়া মাস্টার মশাই অর্থাৎ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আর শিল্পীপ্রবর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্নেহ ভালবাসা ছিল আমাদের অতিরিক্ত পাওনা। ....

শহরের কোলাহল ছেড়ে গুরুদেব শান্তিনিকেতনে গ্রামীণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। শহরের বাইরেও তিনি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারণ, শহরের কৃত্রিম কোলাহলে বোধকরি তিনি জীবনের শান্ত সুমধুর সুরের সন্ধান পেতেন না। প্রাণের সুর খুঁজতে তিনি গ্রামীণ জীবনের সান্নিধ্য ভালবাসতেন। গ্রামভিত্তিক শান্ত সুন্দর জীবন গড়াই ছিল তাঁর স্বপ্ন। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করতে তিনি কোনরকম সংকীর্ণতার পাঁচিল রাখেননি। শান্তিনিকেতনের দরজা খুলে দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' – এটা ছিল তাঁর দর্শন। এই দর্শনের মধ্যে দিয়েই তিনি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।

: আপনার বাবা জওহরলাল নেহরুর সংগেও তো গুরুদেবের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এই মুহূর্তে তা কিছু স্মরণে আসে কি?

: হ্যাঁ – বাবা প্রায়ই গুরুদেবের কথা বলতেন। দেশ-বিদেশে সফরের সময় তিনি তাঁর কথা উল্লেখ করতেন। বাবা বলতেন, গুরুদেব ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম রাষ্ট্রদূত। দেশ-বিদেশে তাঁর সফর, ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ব্যক্তিগত নানা উদ্যোগ আমাদের স্বাধীনতার দাবিকে প্রভূত পরিমাণে জোরদার করেছে।

ইন্দিরার একটু ভাবান্তর ঘটল। কিছুটা আনমনা। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বাবার কাছে শুনেছি, আমার মা কমলা নেহরু যখন মারা গেলেন, বাবা দারুণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। হতাশার সেই অন্ধকার দিনে বাবার কাছে পৃথিবীর আলো-বাতাস সব অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। সেই চরম হতাশা আর দুর্দিনে গুরুদেব বাবাকে অসীম উৎসাহ আর প্রেরণা জোগান। বাবাকে ঋতুরাজ বলে সম্বোধন করে গুরুদেব এক ঐতিহাসিক পত্রে তাঁকে বসন্তের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির আহ্বান জানান। গুরুদেবের সেই পরামর্শ আর আহ্বান বাবাকে জীবন সংগ্রামে নতুন করে উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত করে। ....

সোনালাম হাস্যমুখরিত ইন্দিরা। আলোকচিত্র : লেখক সংগৃহীত

: শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের পর আর কার কথা আপনার বেশি মনে পড়ে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী আর এক নতুন ইতিহাস শুরু করেন। তখন তিনি কিশোরী। এক বিদেশি সাহেব দেখে তিনি অবাক হলেন। শান্তিনিকেতনে সাহেব মানুষ, তাঁর খুবই বিস্ময় লাগে। নাম তাঁর দীনবন্ধু এনড্রুজ। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলেন। আদর করে তাঁদের নাম ধরে ডাকেন। বিদেশি এই পন্ডিতের মুখে বাংলা শুনে ইন্দিরা সেদিন অবাক হয়েছিলেন। ভারতীয় হয়ে নিজে বাংলা বলতে না পারায় তিনি লজ্জা বোধ করেছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর বাংলা শেখার হাতেখড়ি। দীনবন্ধু এনড্রুজ যে এদেশের কত বড় বন্ধু ছিলেন, ইন্দিরা তখনই তা টের পেয়েছিলেন। এনড্রুজ সাহেবের

শান্তিনিকেতনে যোগদান উপলক্ষে গুরুদেব লিখেছিলেন :

প্রতীচির তীর্থ হতে প্রাণরস ধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার –
হে বন্ধু গ্রহণ কর, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দান রূপ যাঁর,
হে বন্ধু চরণে তাঁর করি নমস্কার। ……

* * * * *

১৯৭৮ সাল। নদীয়ার চাপড়ায় সেবার আচমকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। সীমান্ত জেলার এই সীমান্ত গ্রামের দাঙ্গা নিয়ে সর্বত্র চাঞ্চল্য। খবর পৌঁছল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও। তিনি বিশেষ বিমানে দিললি থেকে পাড়ি দিলেন কলকাতা বিমানবন্দরে। সকাল ন'টার আগেই তিনি দমদম বিমানবন্দরে নামলেন। জনাকয়েক নেতা আর আমরা গুটি কয়েক সাংবাদিক। ভাবলাম লাউনজে কিছু সময় বিশ্রাম করে তারপর সড়ক পথে নদীয়ার সেই সীমান্ত গ্রামে যাত্রা করবেন। কিন্তু তাঁর অবসর নেওয়ার সময় কোথায়? বিমান থেকে নেমেই সরাসরি গাড়িতে উঠলেন। আমরাও। পথে পথে ভীড়, শ্লোগান আর প্রায় প্রতি মোড়েই পথসভা। প্রায় প্রতিটি সভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ। এমনি একটানা অঘোষিত অনুষ্ঠান সেরে যখন চাপড়ায় পৌঁছুলেন, তখন বেলা দুটো। অজ পাড়াগাঁ। পাকা পথ নেই, মাটির পথ, তাও এবড়ো খেবড়ো। গ্রামের সীমানায় গাড়ি যাওয়া অসম্ভব। না – আর বিলম্ব নয় – লাফিয়ে নেমে পড়লেন শ্রীমতী গান্ধী। তারপর গ্রামের ভেতরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আশ্বাস। রেবেকা বিবি শ্রীমতী গান্ধীর হাত ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ইন্দিরাকে মা বলে সম্বোধন করতে ইন্দিরার চোখেও অশ্রুভারাক্রান্ত। চোখের জল মুছে ইন্দিরা রেবেকাকে সান্ত্বনার সুরে বললেন, মায়ের কথা মনে রাখবে। বিপদে ধৈর্য হারাবে না। বেলা তখন প্রায় ৫টা। চাপড়া থেকে ফিরে কৃষ্ণনগর সারকিট হাউসে। সেখানে তাঁর খাবারের সব আয়োজনই ছিল। কিন্তু তিনি এক গ্লাস জল ছাড়া আর কিছুই খেলেন না। বললেন, মন এবং শরীর ভাল নেই। শরীর ভাল নয় শুনে সকলে চিন্তিত। শ্রীমতী গান্ধী হাত বাড়িয়ে দিলে দেখা গেল তাঁর উত্তাপ খুব বেশি – ইনফ্লুয়েনজায় তিনি আক্রান্ত।

সকলে তাঁকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। বললেন, ওসব কিছু নয় – শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়। ফের তিনি গাড়িতে চাপলেন। একটানা তিন ঘণ্টার যাত্রায় আবার কলকাতা। সকাল থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাঁর ঐ অনাহার এবং অবিরাম যাত্রার শেষ। কলকাতায় যখন তাঁকে কিছু খেতে বলা হল, উত্তরে বললেন, মাই হাংরি ডটার রেবেকা ইজ দেয়ার। হাউ কুড আই টেক ফুড?

* * * *

৮ মে, ১৯৭৯। একটি সাংবাদিক বৈঠক সেরে ইন্দিরা গান্ধী উঠে দাঁড়ালেন। সাংবাদিকরা তখনও তাঁকে ঘিরে নানা প্রশ্নে ব্যস্ত। কিন্তু তিনি আর কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এগিয়ে চললেন অপেক্ষমান গাড়ির দিকে। দরজা পেরোতেই তাঁর স্বগত উক্তি, কী সুন্দর তোমাদের এই বাগিচা! কলকাতা প্রেস ক্লাবের লন দেখে মুগ্ধ ইন্দিরা। আবার সোচ্চার : দোলনা ভি হ্যায়! আমি দোলনা চড়তে খুব ভালবাসি।

: দোলনা চড়বেন একবার? চলুন না।' এই অনুরোধের জনাই তিনি যেন অপেক্ষা করছিলেন। কিছুটা ইতস্তত করে এগিয়ে চললেন দোলনার দিকে। তারপর দোলনায় চেপে বসলেন। বললেন, তোমরা কেউ ঠেলা দিও না। আমি নিজেই দুলব।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। আবার বললেন, ডোনট পুশ মি। আই মিসেলফ উইল রাইড। …… কথা শেষের আগেই দোলা শুরু হল। অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছি। দোলনায় দুলতে দুলতে তিনি আবার সরব : তুমি কি আমাকে এখন একটি স্কুলের ছাত্রী মনে করছ? ইন্দিরার শিশুসুলভ সরল প্রশ্নের উত্তরে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনাকে দেখে তাই ভাবছিলাম।

দোলনার রিং শক্ত হাতে চেপে ধরে ইন্দিরা গান্ধী জিভ কেটে আমার কথার নীরব প্রতিবাদ জানাতে গেলেন। ফটোগ্রাফাররা লোভ সামলাতে পারলেন না। ক্যামেরা ধরতে দেখেই তিনি জিভ বুজিয়ে গম্ভীর হতে চেষ্টা করলেন। ততক্ষণে আমরা হেসে খুন। □

রমেন দাস

আজ প্রমিস ব্যবহার ক'রে হাজার হাজার পরিবার চিরকালের ব্যবহৃত
লবঙ্গ তেলের
গুণ তো বুঝছেন!
প্রমিস
আপনিও দেখুন না ব্যবহার ক'রে?

প্রমিস
● দাঁতের ক্ষয় রোধ করে,
● মুখে আনে সুস্বাদ, আর
● দূর করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বিশ্বের স্বর্ণপদক বিজয়ী
সুস্থ-সবল দাঁত ও মাড়ি আর নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য

CHAITRA-BLS-668 BEN

কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি সার্ফ কেনেন!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কারণ সার্ফ-এর ওপর খরচ হওয়া একেকটি পয়সা তার প্রভাব দেখিয়ে দেয়। সেজন্যে, যদি আপনি দিলদরিয়া হয়ে খরচ না ক'রে একটু চোখ খুলে খরচ করেন, তাহলে সার্ফ-ই কিনবেন।"

কিন্তু, সস্তার পাউডার কেনায় তো পয়সার দারুণ সাশ্রয় থাকে!

"একদম নয়, কারণ সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সার্ফ-এর সঙ্গে সস্তার পাউডার কি মোকাবিলা করতে পারে? মেপে-জুপে হিসেব করলে দেখবেন, সার্ফ কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সার্ফ কেনাই কেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

"তাহলে শুনুন, সস্তার পাউডারের পুরো এক কিলোর থলিতে যতটা পাউডার থাকে, সার্ফ-এর শুধু ১/২ কিলোর ডিবেতে থাকে ঠিক ততটা পাউডার।"

কিন্তু তবু…

"প্রশ্নই ওঠেনা—কারণ, সবদিক দিয়ে সার্ফ-এর পাল্লাই ভারী হবে। তাছাড়া, যে কোনো সস্তার পাউডার কি সার্ফ-এর মত কাপড়ে এমন শুভ্রতা আনতে পারে? রঙীন কাপড়ে আনতে পারে এমন ঝলমলে চমক? শুধু সার্ফ-ই এক এমন পাউডার, যা দিয়ে ধুলে কাপড় দেখায় সদা নতুনের মত …বারবার ধোয়ার পরও।"

আপনি ঠিকই বলেছেন…

"আর হ্যাঁ, সার্ফ আমার ত্বকেরও কোনো ক্ষতি করে না—মানে, আমার হাত থাকে একেবারে সুরক্ষিত।"

এবার বুঝলাম, সার্ফ লাভের সওদা কেন?

"সত্যি, তাইতো মাসে মাসে তুচ্ছ কয়েকটা পয়সা বাঁচানোর জন্যে সার্ফ-কে আমি কোনোমতেই ছাড়তে রাজী নই। আরে ভাই, পয়সা বাঁচানোই নয়, বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল ভেবে-চিন্তে খরচ করা।"

মেপে-জুপে সব যাচাই করলাম, সার্ফ-এর সওদাই সেরা মানলাম।

LINTAS SU 320 2719 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ইন্দিরা
তাঁর রক্ত দিয়ে তাঁর দলকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে গেলেন

ইন্দিরার ট্র্যাজিক প্রস্থান। রাজীব গান্ধীর প্রবেশ। ভারতবর্ষের ইতিহাস এখন এক ক্রান্তিকালে এসে উপস্থিত। এই প্রবন্ধে পরিবর্তন সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘটনা - পরম্পরা বিশ্লেষণ করেছেন।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেকটা শালগ্রাম শিলার মত। তা সর্বদা কোন পরিণত আকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। খরস্রোতা নদীর প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে সাধারণ শিলাই শালগ্রামে রূপান্তরিত হয়। একজন রাজনৈতিক নেতাও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বার বার ভেঙে গড়তে থাকেন।

তবে ইংরাজিতে যাকে বলে বরন লিডার অর্থাৎ আশৈশব নেতা এমন কেউ কেউ আছেন বৈকি। অনেকে তো মহৎ হয়েই জন্মান। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, নেপোলিয়ন ও হিটলারের মত নেতার ক্ষেত্রেও প্রথম যৌবন পর্যন্ত কেউ ভাবেননি, তাঁরা বিশ্বে বিস্ফোরণ ঘটাবেন। অতদূরে কেন, হলিউডের ফিলম স্টার রোনালড রেগনও কি এক সময় নিজে ভেবেছিলেন যে তিনি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেনট হবেন?

রাজনীতির জগতে ভূরি ভূরি এমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে যোগ্য নেতৃত্বের চেয়ে নেতৃত্বই অনেক সময় মানুষকে যোগ্য করে তোলে। উদাহরণ দেওয়া যাক, আজ যে বরকত গণি খান সাহেব পশ্চিমবঙ্গের একজন স্বীকৃত জনপ্রিয় নেতা, ষাটের দশকে আমি তাঁকে দেখেছি বিধানসভার প্রায় নির্বাক, লাজুক এক সদস্য হিসাবে। এক সাংবাদিক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সে সময় একবার তাঁর পারক সারকাসের বাসায় গিয়েছিলাম কিভাবে তিনি বক্তৃতা দেবেন সে সম্পর্কে তাঁকে সাজেশান দেওয়ার জন্য। সুবোধ ছাত্রের মত তিনি সেদিন আমাদের উপদেশ শুনেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যও বিস্ময়কর। ষাটের দশকে তাঁর নাম ছিল অশ্রুত। তিনি ছিলেন রাজনীতির নিচুতলার কর্মী। তাঁর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার কথাও কেউ চিন্তায় আনেননি। তাছাড়া তাঁর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে আর যাই থাক অর্থনীতি ছিল না। এখন তিনি এশিয়ার শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী বলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। দেশের অর্থনীতিতে তাঁর বিস্ময়কর দখল দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সমগ্র পরিসংখ্যান তাঁর কণ্ঠস্থ। চিন্তা-ভাবনা পরিশীলিত, স্বচ্ছ। আজ তিনি তো প্রধানমন্ত্রী হবার সমস্ত গুণেরই অধিকারী। অথচ তাঁকে যদি একটু একটু করে দায়িত্ব না দেওয়া হত, তাহলে তাঁর মধ্যে এই সম্ভাবনা আমরা দেখতে পেতাম না। তিনি মফঃস্বল কলেজের শিক্ষক হয়েই হয়ত সারা জীবন কাটিয়ে দিতেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আজ যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হবার মর্যাদা পেয়েছেন, যেদিন তিনি প্রথম মন্ত্রিসভায় আসেন সেদিন তাঁর পরিচয় ছিল নেহরুর কন্যা। এমনকি কংগ্রেস সভানেত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের মনে কোন দাগ কাটতে পারেননি। লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁকে মন্ত্রিসভায় ডেকে নিয়েছিলেন সে শুধু নেহরুর প্রতি বন্ধুকৃত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবিতেই।

রাজনীতিতে ভাগ্য বোধহয় একটা বড় সম্বল। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর যদি আকস্মিক মৃত্যু না ঘটত এবং সেদিন পাকিস্তানি আক্রমণের পর সারা ভারতবর্ষে যদি না এক উদ্বেগজনক আবহ-পরিমণ্ডল না থাকত তাহলে কংগ্রেস সংসদ দল শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করতেন কিনা সন্দেহ। সেদিন ইন্দিরা ক্ষমতায় বসেছিলেন ভারত ইতিহাসে সুলতানা রাজিয়ার মত। রাজিয়াকে ক্ষমতায় বসিয়ে ওমরাহদের 'চল্লিশের চক্র' ভেবেছিলেন তাঁরা পুতুলের সুতো ধরে অনবরত টানবেন। কিন্তু সুলতানা রাজিয়া তা হতে দেননি। তিনি প্রকৃত অর্থে হয়ে উঠেছিলেন রানী। ইন্দিরাও তাই। প্রবল ক্ষমতাশালী সিনডিকেট ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। তারপর ইন্দিরার শাসনকাল অতিবাহিত হয়েছে অভ্যুদয়-পতন আবার অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। এ যেন নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে ডুপলিকেট রোল যিনি করতে এলেন, তিনি নিমেষের মধ্যে দেখিয়ে দিলেন অভিনয়ে তিনি দক্ষ ও প্রতিভাবান শিল্পী। আসলে ক্ষমতা পাওয়াটা বড় কথা নয়, সেটিকে রাখাই বড় কথা। ক্ষমতা পাওয়া যেতে পারে কারও দাক্ষিণ্যে, ঐতিহাসিক কারণে, ছলে বলে কৌশলে, কিন্তু তাকে ধরে রাখতে হয় আপন শক্তিতে, আপন প্রতিভায়। ইন্দিরা বার বার সে অগ্নি-

রাজীব ও ইন্দিরা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একম একোদ্বিতীয়ম বলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন।

ভাগ্যের কি চিত্তাকর্ষক খেলা – রাজীব গান্ধীও ক্ষমতায় এলেন কতগুলি নাটকীয় ঘটনা পরম্পরায়। একেই বলে রাজযোগ। রাজীবের ক্ষমতায় আসার জন্য দুটি ঘটনা ঘটতে হল। এবং এই দুটি ঘটনাই ঘটাল নিয়তি। প্রথম ঘটনা সঞ্জয়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যু। রাজীবজী গত বছর আমাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 'সঞ্জয় বেঁচে থাকলে আমি রাজনীতিতে আসতাম না।' সত্যিই তাই – রাজনীতির কথা তিনি কখনও ভাবেননি। প্রধানমন্ত্রীর ছেলে, নেহরুর নাতি, রাজনৈতিক পরিমন্ডলে মানুষ। কিন্তু রাজনীতি থেকে ফয়দা তোলার চেষ্টা করেননি কখনও। এমনকি ব্যবসাপত্রও করতে যাননি। পাইলটের ঝুঁকিবহুল, পরিশ্রমসাধ্য পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন। রাজনীতির চেয়ে ঊর্ধ্ব আকাশই তাঁকে আকর্ষণ করত বেশি। সঞ্জয় একসময় রাজীব সম্পর্কে বলেছিলেন, 'দাদাকে দিয়ে কিছু হবে না, তার যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।'

সঞ্জয় ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্দাম, বেপরোয়া, একনায়ক হবার সব গুণ তাঁর ছিল। সঞ্জয় প্রধানমন্ত্রী হলে ভারত এক ডিক্টেটরকে পেত। শ্রীমতী গান্ধীর অন্ধ স্নেহ ছিল তাঁর ওপর। তিনি তাঁর কোন দোষ দেখতে পেতেন না। সঞ্জয় সম্পর্কে যাঁরাই তাঁকে সাবধান করতে গিয়েছেন তাঁরাই তাঁর বিষ নজরে পড়েছেন। সঞ্জয়ের পরামর্শেই তিনি চলতেন। আবার ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিতে হয়। তিনি ছিলেন সেদিন ঔরংজীব প্রভাবিত সাজাহান। আর রাজীব যেন দারা। দারা শিকোর মত তিনি পন্ডিত নন, তবে বিচক্ষণ, বিনয়ী এবং নম্র।

সঞ্জয়কে প্রধানমন্ত্রী করার বাসনা ছিল ইন্দিরার। কিন্তু কাজটা দুঃসাধ্য ছিল। তাছাড়া সঞ্জয় তাঁকে ক্রমশ অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলছিলেন। সঞ্জয়ের শোচনীয় মৃত্যু একদিকে যেমন চরম আঘাত ছিল, অন্যদিকে শ্রীমতী গান্ধী বহু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন সেদিন।

সঞ্জয়ের প্রস্থান, রাজীবের প্রবেশ। রাজীব প্রথমটায় এসেছিলেন কিছুটা মাতৃভক্তির জন্য। শ্রীমতী গান্ধী ঘরে বাইরে নানা কৃতঘ্নতা, নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন। সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর মানেকাকে নিয়ে পরিবারে ভাঙন শুরু হয়ে গেল। সেই সময় ইন্দিরা একেবারে একা এবং নিঃসঙ্গ। রাজীব-পত্নী সোনিয়া সেই দুঃসময়ে শাশুড়িকে যেভাবে সেবা করেছিলেন তাতে ইন্দিরা অভিভূত। আমি ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশ ভ্রমণের সময় দেখেছি বস্তুত সোনিয়া শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত পরিচর্যা করছেন। রাজীব মায়ের কাজ লাঘব করার জন্যই পাইলটের চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। কিন্তু ইন্দিরার মধ্যে একটা সেনটিমেনট বার বার কাজ করছিল সেটি হল, যতদিন সম্ভব নেহরু বংশের লোকরাই ভারতবর্ষ শাসন করুক। ইন্দিরা ভারতবাসীর মনোভাব বুঝেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতির ধারা ততদিনে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এখনও সাধারণ মানুষের কাছে নেহরু নামটি ম্যাজিকের মত কাজ করে। ইন্দিরা যদি সেই উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করে নিজগুণে – ভারতের জনগণকে কাছে টানতে পারেন, তাহলে তাঁর ছেলেই বা পারবে না কেন?

ইন্দিরার হিসাবে ভুল ছিল না। সঞ্জয় অচিরেই যুবনেতা হয়ে উঠেছিলেন। অথচ রাজনীতিতে সঞ্জয়ের হাতেখড়ি হয়েছিলই বা করে? একদা এক সুন্দর প্রভাতে তিনি জেগে উঠে দেখলেন, তিনি একজন বিখ্যাত যুবনেতা হয়ে গেছেন।

সাংবাদিক হিসাবে আমি ইন্দিরা গান্ধীকে দেখে এসেছি ১৯৬৪ সাল থেকে। তখন তিনি তথ্য ও বেতার দফতরের মন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় নতুন। যথেষ্ট লাজুক। সে সময় সাংবাদিকরা তাঁকে খুব সিরিয়াসলি নেননি। ভাবখানা এই, বড়লোকের মেয়ে, শখ করে রাজনীতিতে এসেছে। কিছুদিন যাক না, বুঝবে কত ধানে কত চাল। এখন যেমন রাজীব সম্পর্কে অনেকে এসব কথা ভাবছেন।

রাজনীতিতে প্রচন্ড সাফল্য অর্জন করেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। আমি তো দেখেছি সারা ভারতবর্ষে তিনি যেখানে গেছেন সেখানে স্টারের মত জনতা তাঁকে ছেঁকে ধরেছে। বিদেশেও পেয়েছেন অসাধারণ খাতির। গত দুতিন বছর ধরে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি তাঁকে। তাঁর সঙ্গে বিদেশে গিয়ে দেখলাম রাষ্ট্রসংঘে তাবৎ দেশের নেতারা তাঁকে খাতির করছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে যেন ধন্য হচ্ছেন। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি, গ্রীস ভ্রমণের সময় ডেলফির এক রেস্তোরাঁয় শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে খেতে গিয়েছি। তখনও তিনি এসে পৌঁছননি। আমরা সাংবাদিকরা আগে থেকে এসে বসে আছি। হঠাৎ পাশে তিনচারজন মারকিন পর্যটকের একটা দল আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, শ্রীমতী গান্ধী নাকি এখানে আসছেন, আমাদের সঙ্গে খাবেন? আমি বললাম হ্যাঁ। এক ভদ্রমহিলা খুশিতে ডগোমগো হয়ে উঠলেন, আমার গ্রীস ভ্রমণ সার্থক হল। কী ভাগ্য! মিসেস গান্ধীর সঙ্গে এক সঙ্গে বসে লানচ খাব আজ। একটু পরে মিসেস গান্ধী এলেন। ডাইনিং হল পর্যটকে ঠাসা। সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগল। যেন তাদের জীবনের বড় একটা আশা পূর্ণ হল। ডেলফি বা অ্যাকরোপলিস দেখতে গেছেন শ্রীমতী গান্ধী, সারা পৃথিবীর পর্যটকেরা সেখানে ঘুরছেন। হঠাৎ দেখেন শ্রীমতী গান্ধী। অমনি গ্রীসের অনুপম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখা মাথায় উঠল তাঁদের। তাঁরা ক্যামেরার সব ফিলম খরচ করে ফেললেন শ্রীমতী গান্ধীর ছবি তুলতে।

নেহরুর মত আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি কামনা ছিল ইন্দিরার। চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক সম্মান। পেয়েছেনও। কিন্তু একটা জিনিস তিনি পাননি। এজন্য তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। নেহরুও এজন্য ক্ষোভ নিয়ে মারা গেছেন। সেটি হল নোবেল পুরস্কার। শ্রীমতী গান্ধী খুব চেষ্টা করেছিলেন সেটি পাবার। পাননি। অথচ এটি তাঁর প্রাপ্য ছিল। জোট নিরপেক্ষতা আন্দোলন ও শান্তির জন্য তাঁর অবদান যে কোন বর্তমান রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে বেশি। আর একটি ব্যাপারে তাঁর প্রবল অভিপ্রায় ছিল; সেটি রাজীব তাঁর পর প্রধানমন্ত্রী হোক। কিন্তু কিভাবে তিনি এগুবেন সে সম্পর্কে তাঁর নির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি এটাও বুঝেছিলেন এটা ভীষণ একটা শক্ত ব্যাপারে। তবে রাজীব ভবিষ্যতে

গুরুনানকজির পুণ্যবাক্য পাঠ

প্রধানমন্ত্রী হোন বা না হোন তিনি মন্ত্রিসভায় ইন্দিরার বিশ্বস্ত সহায়ক হয়ে আসুন এইভাবেই তিনি রাজীবকে তৈরি করেছিলেন। এমনকি রাজীবের রাজনৈতিক পরামর্শও তিনি গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। অন্ধ্রের ঘটনাই তার প্রমাণ। খান ও ধোতের মত কানু কংগ্রেস (ই) রাজনীতিবিদকে দল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। ইদানীং রাজীব আর ব্যাক সিটের ড্রাইভার ছিলেন না। তিনি নিজের মতামত, পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী কাজ করছিলেন। সঞ্জয়ের মত তাঁর নিজস্ব পছন্দ মানুষজন তৈরি হয়ে গিয়েছিল – সাংবাদিকরা যাকে ব্যংগ করে 'ককাস' বলেছেন। ইন্দিরা মনে মনে খুশিও হয়েছিলেন, রাজীব যে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তৈরি করে ফেলছেন। তিনি আর 'মাম্মীজ বয়' নেই। রাজনীতিতে তাঁকে পাকাপোক্তভাবে আসন তৈরি করতে গেলে তাঁর 'ভাল মানুষ' ইমেজটাকে আগে দূর করা দরকার। রাজনীতি বড় নির্মম, বড় কঠোর। ইন্দিরাও তো একদিন রাজীবের মতই নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু বার বার ঘা খেতে খেতে তিনি শক্ত মানুষ হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন রাজনীতি হল যুদ্ধের মত, শত্রুকে যদি তুমি আগে মারতে না পারো তাহলে সে তোমাকে শেষ করে দেবে।

রাজনীতিতে কারও সাফল্য নির্ভর করে দুঃসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার সাফল্যও নির্ভর করেছে ওই সঠিক সিদ্ধান্তগুলির উপর। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটি অনেকটি অনুভূতি প্রবণতার উপর নির্ভর করে। যাকে ইংরাজিতে বলে ইনটিউশন। যে কোন সফল পরিচালকেরই একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, যা দিয়ে তিনি আগাম ভাল মন্দ বুঝতে পারেন। তাছাড়া রাজনীতির অনেক খেলাই ক্রিফলা বর্শার মত। এক চুল হিসেবে ভুল হলেই মৃত্যু। কুশলী খেলোয়াড়ের হিসেবে ভুল হয় না। তিনি প্রতিদিন হাততালি পান। ধরুন ১৯৬৯ সালে গিরি বনাম সঞ্জীব রেড্ডির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ইন্দিরা গিরির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু রেড্ডি তো নির্বাচনে জিততেও পারতেন, তাহলে কী হত? ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ঠিক সময় কতগুলি ঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে আমেরিকা এসে তো সব কিছু ভন্ডুল করে দিয়েছিল আর কী! তাহলে ৯০ লক্ষ উদ্বাস্তু আর বিশ্বজোড়া বদনাম নিয়ে ইন্দিরার রাজনৈতিক জীবন খতম হয়ে যেত। পাকিস্তান এখন ৩০ লক্ষ আফগান উদ্বাস্তু নিয়ে যেমন ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছে তেমনি হত ভারতের অবস্থা। কিন্তু ইন্দিরা কিস্তিমাৎ করলেন।

ইতিহাসে এক একটা যুগ আসে যা নানা বর্ণাঢ্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। একে বলা হয় স্বর্ণযুগ। আর্থিক সমৃদ্ধির সংগে এই শব্দটির সম্পর্ক আছে বলে ইন্দিরা যুগকে স্বর্ণযুগ বলতে সাহস পেলাম না। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি গৌরবময় যুগ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ এই ১৭ বছর নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রিত্ব-কাল ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৮৪। মাঝখানে তিনবছর বাদ দিয়ে সবশুদ্ধ ১৫ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে ইন্দিরার এই ১৫ বছর ইতিহাসে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। সংকটপূর্ণ তো বটেই। ব্যাংক ও জীবনবীমা জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপের মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল তাঁর রাজত্বকালেই। সিকিমের ভারতভুক্তি তাঁরই হাতে। বাংলাদেশ বলে একটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে তাঁর এক বছরের বেশি সময় লাগেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে বিশ বছরের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি করে তিনি এমন একটা প্যাঁচে ফেলে দিয়েছেন পাকিস্তান চীন ও আমেরিকাকে যে তারা এখন ভারত আক্রমণের ব্যাপারে দুবার ভাববে। রাশিয়া তো আফগানিস্তান পর্যন্ত এসে বসে আছে। নেতৃত্ব বদলের পর চীন এখন আর সীমান্ত গোলমাল নিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না। ইদানীং তো বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি

পরিবর্তন-এর কপি উপহার দিচ্ছেন পত্রিকা-সম্পাদক

পাচ্ছিল, মুদ্রাস্ফীতি কমে আসছিল। শ্রীমতী গান্ধী আরও যে জন্য ইতিহাসে গুরুত্ব পাবেন সেটি তিনি কংগ্রেসকে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো থেকে সরিয়ে এনে একটি মনোলিথিক দলে পরিণত করেছিলেন। একশ বছরের ইতিহাসে কংগ্রেসে প্রথম ভাঙন ধরল। দল দু-তিন ভাগে ভাগ হল। তিনি ভগ্নাংশের সংগে নিজের নাম যোগ করলেন। নেত্রীর নামে দলের ইমেজ বাড়াবার ঘটনা ভারতে এই প্রথম। দেখা গেল কংগ্রেস এই বিরাট সংগঠনটি আর ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে টিকে থাকতে পারছে না, একমাত্র ইন্দিরার নাম ছাড়া। তা না হলে সংগঠন কংগ্রেস টিকল না কেন? আবার অন্য নাম যুক্ত হওয়ায় আরস কংগ্রেস কোথায় হারিয়ে গেল। এখন তো কংগ্রেস বলতে একটাই ইন্দিরা কংগ্রেস। ইন্দিরা জীবন দিয়ে নামটিকে দীর্ঘস্থায়ী করে গেলেন। একটি মানুষ পরিণত হয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠানে। রাজনীতিতে একমাত্র মারকস ও লেনিন এমন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন, তাও খোদ রাশিয়ায় নয়। সেদেশে কমিউনিস্ট পারটির নাম মারকসপন্থী বা লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পারটি নয়। এখন ইন্দিরা ও তাঁর চিন্তাধারাকে যদি তাঁর অনুগামীরা একটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক মতাদর্শ বলে দেশের লোক স্বীকার করেন তাহলে তাঁর ছেলেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে কেন দেশের লোক মেনে নেবেন না? ভারত তো গুরুবাদেরই দেশ। গুরুবাদে একটা পরম্পরা থাকে। সে পরম্পরা গুরু-পুত্রেও বর্তাতে পারে।

রাজীব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হলেন, যখন জাতি আকস্মিক আঘাতে শোকমগ্ন। এই শোকের মুহূর্তে প্রয়াত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর মধ্যেই মানুষ তাঁর স্মৃতি খুঁজে ফেরে। শ্রীলংকাতে বন্দরনায়ক যখন নিহত হলেন, তখন শ্রীমতী বন্দরনায়ককে দেশের মানুষ ক্ষমতায় বসিয়েছিল। বাংলাদেশে মুজিবর রহমানের কন্যা হাসিনা ও জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নী খালেদাও গৃহকোণ ছেড়ে জনারণ্যে এসেছেন জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্যই। এগুলিকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই সকলে মেনে নিয়েছেন। রাজীব তো রাজনীতিতে আগেই তালিম নিয়েছিলেন। তিনি একজন নির্বাচিত লোকসভা সদস্য। এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক। দলের কাজকর্ম দেখছেন ১৯৮০ সালের ২৩ জুন সঞ্জয় গান্ধীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কিছুকাল পর থেকেই। অন্তত তিন বছর তিনি রাজনীতি করছেন। কিন্তু বাংলাদেশে হাসিনা বা খালেদা অথবা পাকিস্তানে বেগম ভুট্টোর রাজনীতির অভিজ্ঞতা একদিনেরও নেই।

রাজীবের পক্ষে যে গুণগুলি আছে সেগুলি হল তাঁর আজন্ম আংলো ইনডিয়ান স্কুলের শিক্ষা। ডুন স্কুল ও ট্রিনিটি কলেজের তিনি ছাত্র। কেমব্রিজেও পড়েছেন কিছুদিন। নেহরুর মত তিনি ইনটেলেকচুয়াল নন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান ও বিদগ্ধ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা তিনি সহজেই চালাতে পারবেন। তাছাড়া এও একটা দেখার ব্যাপার – ৪০ বছর বয়সে একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হলেন। সারা পৃথিবীতে এমন ঘটনা কতবারই বা ঘটেছে? সাম্প্রতিককালে মনে পড়ছে আলজিয়ারসের বেন বেলাকে। ৩৯ বছর বয়সে

তিনি রাষ্ট্রনায়ক হয়েছিলেন।

রাজীব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হবার সময় এখনও আসেনি, সমালোচনারও নয়। ভারতবর্ষের কোন 'হূজ হূ'তে এখনও রাজীবের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজীবকে তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রী করে কংগ্রেসী নেতারা এই প্রথম বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। মনে রাখতে হবে শাস্ত্রীর পর মোরারজী না ইন্দিরা এই প্রশ্নে কংগ্রেসী সংসদীয় সভা উথালপাতাল হয়ে উঠেছিল। একজন কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রীর উপর নয়দিন ধরে দেশের শাসন ভার ছিল। রাজীবের প্রধানমন্ত্রী পদে আসতে ন ঘণ্টা লাগেনি।

তড়িঘড়ি যদি রাজীবকে প্রধানমন্ত্রী না করা হত তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে দাবিদারদের সংখ্যা বাড়ত। দাবিদার না বাড়লেও কাকে প্রধানমন্ত্রী করা যায় সেটা নিয়ে বিতর্ক চলত যা আর শালীনতার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত না। সমস্ত বিধি মেনে চললে প্রণব মুখারজিরই তো প্রধানমন্ত্রী হবার কথা। কারণ তিনি ইন্দিরা মন্ত্রিসভায় মর্যাদায় ছিলেন দ্বিতীয়। কিন্তু তিনি বাঙালি বলেই বাঙালির কাছ থেকেই প্রতিবন্ধকতা আসত। তাহলে কি নরসিমা রাও? তিনিও বিচক্ষণ কিন্তু প্রণববাবুর মত তিনিও ভদ্র, নিজের প্রোফাইল নিচু রাখাই পছন্দ করেন। বুটা সিং-এর ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই আসে না। চাবনও তো ছিলেন দেশের বাইরে। শেঠিও কিছুকাল আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবেই ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযুক্ত। যাকেই প্রধানমন্ত্রী করা হোক, তিনি বিতর্কের অতীত হতেন না। নেহরুর পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে যে কারণে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল ঠিক সেই সেই কারণগুলি রাজীবকে প্রধানমন্ত্রী করার পিছনে ছিল। এতে একটা সবচেয়ে বড় সুবিধে ইন্দিরা হত্যার পর যে পাবলিক সেনটিমেনট গড়ে উঠেছে দেশজুড়ে তাতে আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) তার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারবে। তা না হলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)-এর নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়া মুশকিল হয়ে যেত। এই সব ভেবেই তো ইন্দিরা নির্বাচন ঘোষণায় গড়িমসি করছিলেন। কেউ কেউ বলছিলেন তিনি নির্বাচন পিছিয়েও দিতে পারেন।

কংগ্রেস (ই)-এর অবস্থা খারাপ করে তুলেছিলেন ইন্দিরা নিজেই। আমার কাছে এখনও আশ্চর্য লাগে তাঁর মত একজন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না মহিলা কেন এক সংগে এতগুলো ফ্রনট খুলতে গেলেন। সিকিম, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, অন্ধ্র? সিকিম না হয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আর পাঞ্জাব ছিল একটা পাকা ফোঁড়ার মত। অপারেশন না করলে চলছিল না। কিন্তু কাশ্মীর? কাশ্মীর বাদ দিলেও অন্ধ্র? আমাকে দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর একজন সচিব পদের ব্যক্তি শপথ করে বলেছিলেন অন্ধ্রে রামলাল রামা রাওকে বরখাস্ত করেছেন শ্রীমতী

সাইপ্রাসে ইন্দিরা

গান্ধীকে না জানিয়ে। কিন্তু এও অবিশ্বাস্য ছিল। এতবড় একটা ঘটনা, শ্রীমতী গান্ধী জানতেন না! তারপর রাজীব যখন অন্ধ্রের ব্যাপারে রামলালকে সমর্থন করলেন তখন অনেকে ভাবল তাহলে কি রাজীবজী সরাসরি কোন আদেশ দিচ্ছেন। এক সময় সঞ্জয় যেমন দিতেন? ১ সফদরজংগ রোড সম্পর্কে অনেক গুজব রটে বাজারে। সত্য কথা জানা মুশকিল। সাংবাদিকরা ঘুড়ি ওড়ান। এখনও এটা তাই রহস্য থেকে গেল অন্ধ্র কাশ্মীরের ঘটনা ঘটেছিল কার পরামর্শে? শ্রীমতী গান্ধীর কিছু ব্যুরোক্র্যাট উপদেষ্টা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। যেমন ত্রিপাঠি, আলেকজানডার। শ্রীমতী গান্ধী এঁদের চাকরি ছাড়িয়ে রাজনীতিতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। নিজের দলের মধ্য থেকে তিনি ক্যাবিনেটে নেবার মত খুব বেশি দক্ষ অথচ বিশ্বাসী লোক পাচ্ছিলেন না। এগুলো কি তাঁদের পরামর্শ ছিল? যেমন ১৯৭৬ সালে জরুরী অবস্থা জারি করার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থা জারি করেছিলেন। সেটা দেশের বহু লোক ভাল চোখে নেয়নি। বিরোধীরা যদি এক হত, তাদের মধ্যে যদি সততা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতা থাকত তাহলে শ্রীমতী গান্ধী আবার অত তাড়াতাড়ি ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কারণ এটা ঠিক জরুরী অবস্থা জারি করার ফলে দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী শ্রীমতী গান্ধীর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যদিও সাধারণ মানুষ খুশি হয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধী প্রকৃত পক্ষে দেশের সংবাদপত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশের কাছ থেকে কোন সমর্থন পাননি। কাগজ খুললেই দেখা যেত সবাই ইন্দিরার বিরুদ্ধে লিখছে। ইন্দিরার স্বৈরাচারী, বংশ পরম্পরায় শাসন ক্ষমতা কায়েম করতে চান তিনি, তিনি নির্মম এমন একটা ইমেজ বিরোধী দল ও সাংবাদিকরা মিলে তৈরি করেছিল দেশ জুড়ে। বিরোধীরা বলত ইন্দিরাই দেশের সামনে বড় বিপদ। ইন্দিরার ভাল কাজেরও বিরোধিতা হয়েছে। উগ্রপন্থীদের কাজকর্মকেও অনেক সাংবাদিক সমর্থন করেছেন অথবা উগ্রপন্থী-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে মানবতা-বিরোধী বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত পক্ষে দেশের প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই ইন্দিরা সংগে পাননি। অথচ দেশ গঠনে তাঁদের সাহায্যের দরকার ছিল। এর জন্য দায়ী ইন্দিরা কংগ্রেসের ইমেজ। ইন্দিরা কংগ্রেস শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের পরিহার করে এক ক্যাডারভিত্তিক দল গঠনে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। ওঁরা ভেবেছিলেন, কমিউনিসট বা আর এস এস-এর মত কংগ্রেসেরও সারাক্ষণের ক্যাডার গড়ে তুলতে হবে। এ নিয়ে তাঁরা অনেকগুলি প্রশিক্ষণ শিবিরেরও সূচনা করেছিলেন। খালিস্তান আন্দোলন যেমনভাবে গোকুলে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং কিছু কিছু বিরোধী নেতা তাতে যেমন মদত জুগিয়ে চলছিলেন ইন্দিরা তাতে বেশ বুঝতে পারছিলেন অর্থবলে বলীয়ান বিদেশি মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীরা তাঁর সামনে প্রকৃত সংকট সৃষ্টি করছে। অকালি আন্দোলনকে তিনি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে পারেননি। অবস্থা দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাই ত ঁ মিলিটারি অ্যাকশনের কথা ভাবতে হয়ে ।। তিনি বহু ইতস্ততঃ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মিলিটারি কখনই শেষ কথা নয়। কিন্তু তিনি পড়েছিলেন উভয় সংকটে। শিখদের সমর্থন তো তিনি হারিয়েছিলেন। মুসলমানদের সমর্থনের উপর আর আগের মত ভরসা করতে পারছিলেন না। অথচ আর দেরি করলে দেশের মেজরিটি হিন্দু সমর্থনও তিনি হারাতে বসেছিলেন। অকালিদের কাজকর্মে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন হিন্দুরাই বেশি। তা বাদে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বি জে পি হিন্দুদের ইতোমধ্যেই যথেষ্ট তাতিয়ে তুলেছিল। তাই স্বর্ণমন্দিরে মিলিটারি না পাঠিয়ে ইন্দিরার উপায় ছিল না। না পাঠালে পঞ্চনদের তীরে আরও অজস্র রক্তপাত ঘটত।

এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সবদিক থেকে যেন একেবারে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এমন একটা অবস্থা যেখানে তূণ থেকে সব বাণ ছুঁড়ে তিনি প্রায় নিরস্ত্র হয়ে সপ্তরথীর সামনে দাঁড়িয়ে। এই দুঃসময়ে, এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ঘাতকের বুলেট আবার তাঁকে এক মুহূর্তে সব কিছু ফিরিয়ে দিল। নিজের জীবন দিয়ে তিনি তাঁর দলকে পুনর্জীবন দিয়ে গেলেন। আবার এখন ইন্দিরা-হাওয়া। এই হাওয়া যদি এলোমেলো ঝড়ে পরিণত না হয় তাহলে এখনই ইন্দিরা-অনুগামীরা নির্বিঘ্নে পাল তুলে দিতে পারেন। এবং সে তরণীর হাল ধরে যদি রাজীব গান্ধী থাকেন তাহলে তো কথাই নেই। □

‘রাজনীতির চেয়ে আকাশে ওড়ার মধ্যে অনেক বেশি মজা’ – রাজীব গান্ধী

শ্রীমতী গান্ধী আজ আর নেই। তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হয়েছেন তাঁরই পুত্র রাজীব গান্ধী। এর আগে রাজীব গান্ধীর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন পরিবর্তন সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকারটি ১৯৮৩র ২২ – ২৮ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হওয়ায় সাক্ষাৎকারটির অংশবিশেষ আবার আমরা পুনঃপ্রকাশ করলাম।

পরিবর্তন : দেখুন, দলাদলির জন্য কংগ্রেস (ই) শেষ হয়ে যাচ্ছে। দলের কোন উন্নতি হচ্ছে না। বর্তমানে বিহার, হরিয়ানা, পাঞ্জাব সর্বত্র বিরোধীরা শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোন্দলে নেমেছে। পার্টিতে শৃঙ্খলা আনার জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

রাজীব : আমরা কতগুলি ব্যবস্থা নিয়েছি। বোধহয় দেখেছেন বিরোধীরা এখন বেশ নরম। আগে পার্টিতে বিশৃঙ্খলা ছিল। আমরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছি।

পরিবর্তন : আমি শুনলাম, আপনি কংগ্রেস (ই)-কে ক্যাডার-ভিত্তিক দল করতে চান, এই ব্যাপারে যুব কংগ্রেসকে চাঙ্গা করার কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

রাজীব : কংগ্রেসের মত দল কখনও ক্যাডার-ভিত্তিক হতে পারে না; সত্যি কথা বলতে কি, ভারতের মত এত বড় দেশে ক্যাডার ভিত্তিক দলের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা শক্ত। আমরা আমাদের যুব কংগ্রেস, সেবাদল প্রভৃতি সামনের সারির সংগঠনগুলিকে চাঙ্গা করে তুলছি। কমিউনিস্টরা বা বি জে পি-রা যে অর্থে ক্যাডার তৈরি করে, আমরা সেই অর্থে ক্যাডার গড়ে তুলতে চাই না। আমরা চাই গান্ধীজী ও পণ্ডিতজীর বাণী এবং কংগ্রেসের ভূমিকা লোকের কাছে তারা তুলে ধরুক।

পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের শক্তি কতখানি, দুর্বলতাই বা কোথায়, সে সম্পর্কে কোন পরিমাপ করেছেন? আপনি কি মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আর কোনদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না?

রাজীব : পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের দিন ফুরিয়েছে এমন কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। গত ভোটের ফলাফলের দিকেই তাকিয়ে দেখুন না। আমরা অনেক ভোট পেয়েছি – ৩৩ বা ৩৪ পারসেনট। এটাই প্রমাণ করে, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের যথেষ্ট সমর্থক আছেন। তবে হ্যাঁ, আমাদের দুর্বলতা হল অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এটা দূর করার চেষ্টা করছি। ১৯৮৫ সালের নির্বাচনের আগে অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে দেখবেন।

পরিবর্তন : আপনার নির্বাচনী কেন্দ্রে কেমন কাজ করছেন?

রাজীব : আমেথিতে অনেক কাজ করছি। বস্তুত, ওখানে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। তবে দেখুন, যখনই উন্নয়নমূলক কাজ কোথাও হয়, তখনই লোকের প্রত্যাশাও বেড়ে যায়। আমরা এখন এই প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করছি।

পরিবর্তন : এবার দু-একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব। আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে, সঞ্জয় হঠাৎ মারা না গেলে আপনি রাজনীতিতে আসতেন না?

রাজীব : হয়ত তাই। আমার ভাই বেঁচে থাকলে আমি রাজনীতিতে আসতামই না।

পরিবর্তন : রাজনীতিতে বেশি মজা পান, না প্লেন চালানয় বেশি মজা?

রাজীব : আমার মনে হয়, প্লেন চালানো অনেক বেশি মজাদার (হাসা)।

পরিবর্তন : এর মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই ঠিক করতে পেরেছেন কোন কোন সমস্যা দেশের বড় সমস্যা এবং তাদের আগে সমাধান দরকার?

রাজীব : আমার মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা যে, আমরা শিক্ষার দিকে বেশি জোর দিইনি। সেই সঙ্গে উন্নয়নের সামাজিক দিকটাও উপেক্ষা করেছি। সামাজিক দিক অর্থে, সমাজকে একত্রে বেঁধে রাখার প্রণালী। অনেকগুলি বাঁধাধরা সমস্যা আছে, প্রত্যেকেই জানে, যেমন শক্তি, যোগাযোগ, কৃষি। কৃষির উৎপাদন বাড়ছে না, যেমন বাড়া উচিত ছিল। এসবের মূল হচ্ছে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি। যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে আমাদের দেশের লোকদের নিজেদের উদ্যোগ বা আগ্রহবোধ জন্মাচ্ছে না। কিছু কিছু লোকের উদ্যোগ আছে, কিন্তু আমি বলছি বেশিরভাগ লোকেই স্বনিযুক্তির চেয়ে চাকরি চান। এত লোকের সবাইকে চাকরি দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

পরিবর্তন : আপনার অভিমত আর আপনার মায়ের অভিমত কি ভিন্ন?

রাজীব : কতকগুলি জায়গায় তো আমাদের মতামত আলাদা হবেই। তবে দেশ কীভাবে কোন পথে চলবে এ ব্যাপারে মৌলিক কোন তফাৎ নেই।

পরিবর্তন : আপনার ব্যক্তিগত আগ্রহ কী কী বিষয়ে?

রাজীব : এখন বলা খুব মুশকিল। এখন তো সময়ই পাই না (হাসা)। তবে আগে ফোটোগ্রাফির শখ ছিল। অ্যামেচার রেডিও অপারেটরগিরি করতাম। এখনও মাঝে মাঝে করি। অল্পস্বল্প ছবি এখনও তুলি।

পরিবর্তন : আপনার দাদামশাই ভারত আবিষ্কার করেছিলেন। মা নিজেকে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম করেছেন। আপনি দেশের খেটে-খাওয়া গরিব মানুষদের কতখানি জেনেছেন?

রাজীব : আমি প্রায়ই ঘোরাঘুরি করি। দেশের অনেক জায়গায় গিয়েছি। তাদের সমস্যা দেখেছি। অনেক জায়গায় আমাদের লোকেরা প্রচণ্ড অনগ্রসর। অনেক কিছু কাজ তাদের জন্য করার আছে।

পরিবর্তন : একজন প্রধানমন্ত্রীর কোনটা করা উচিত আর অনুচিত?

রাজীব : আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের ব্যবস্থায় দুর্নীতি আর অপদার্থতা নিয়ে তিতিবিরক্ত। দুটো ব্যাপারে এখনই কিছু করতে না পারলে জনসাধারণের মনোবল একেবারে ভেঙে যাবে। দেশ দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্যদিকে আমরা উৎসাহ পেলে অন্য যে কোন দেশের লোকের তুলনায় অনেক বেশি কাজ করতে পারি। আমাদের দেশ কেন এগিয়ে যেতে পারবে না আমি তার কারণ দেখছি না। □

‘সুকন্যা’কে ইন্দিরা গান্ধী

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমাদের দিল্লির প্রতিনিধি শ্রীমতী গায়ত্রী রায় সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। একেবারে অরাজনৈতিক সাক্ষাৎকার। ঐ দীর্ঘ আলোচনায় রাজনীতির একটি কথাও ছিল না। নানা বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সব প্রশ্নই ছিল সামাজিক।

তখন থেকেই আমরা স্থির করি, তাঁর আগামী জন্মদিন ১৯ নভেম্বরের আগেই অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর সংখ্যায় এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারটি উপহার দেব পাঠক-পাঠিকাদের। সংখ্যাটি শ্রীমতী গান্ধীরও হাতে তুলে দেব।

আগামী জন্মদিনের ১৯ দিন আগে বর্বরতা তাঁকে পার্থিব জগৎ থেকে পরলোকে নিয়ে গেল। আজ তাঁর সেদিনের প্রতিটি বক্তব্য আমাদের সকলের কাছে উপদেশ ও পরামর্শের মত।

১৬ নভেম্বর সুকন্যায় আর থাকছে ইন্দিরাজী প্রসঙ্গে ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন ও তাঁর কর্মজীবনের নানা ঘটনা।

‘সুকন্যা’র এই সংখ্যাটি পেতে হলে আজই কাছের স্টলে বা হকারকে বলে রাখুন, কিংবা আমাদের সার্কুলেশন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ইত্যাদি প্রকাশনী লিঃ, কলকাতা ৭০০ ০৭২

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার জন্য দায়ী কি বিদেশী গুপ্তচর বাহিনী?

ইন্দিরা শেষ শয্যায়ঃ টেলিভিশনের পর্দা থেকে

নিজস্ব দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুকে ঘিরে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বহু রাজনৈতিক মহলের সামনে এখন একটা প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, এই হত্যা কি নিতান্তই ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে, না কি রাজনৈতিক হত্যা? তবে কি বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীর মদতে এবং সুপরিকল্পিত ষোগসাজসেই এই মৃত্যু?

প্রশ্নটা নিতান্ত মামুলি নয়। বিশেষ করে এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন ভারত তৃতীয় বিশ্বের বুকে অন্যতম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে পা বাড়িয়েছে, যখন ভারতের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের দরবারেও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে এবং পাশাপাশি ভারতের বুকে বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীর কার্যকলাপও ভয়ংকরভাবে প্রমাণিত হয়েছে বারংবার।

বিদেশি গুপ্তচর বাহিনী ভারতের মাটিতে কতখানি সক্রিয়, এ প্রশ্নের জবাব মিলেছে সাম্প্রতিককালেই ১৯৪৩ র নভেমবর মাসে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে ধরা পড়লেন দিললির অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এফ ডি লারকিনস এবং তাঁর ভাই এয়ার ভাইস-মারশাল কে এইচ লারকিনস। লারকিনস ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ডিপ্লোম্যাট হ্যারি এল ওয়েদারবি-র সংগে যোগসাজসে মারকিন গুপ্তচর বাহিনী সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেনসি (সি আই এ)-র কাছে ভারতের সামরিক বাহিনীর গোপন নথিপত্র তুলে দিচ্ছিলেন দীর্ঘ বছর ধরে। তাঁদের সংগে হাত মিলিয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর আরো এক লেফটেন্যানট করনেল যশবীর সিং এবং জনৈক ব্যবসায়ী যশপাল সিং গিল। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সূত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে ঐ লারকিনস ভাইরা অত্যন্ত সতর্কতা এবং গোপনীয়তার সংগে সামরিক বাহিনীর তিনটি বিভাগেরই গোপন নথিপত্র বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সি আই এ-র হাতে তুলে দিতেন এবং বিনিময়ে পেতেন মোটা অংকের পারিশ্রমিক। তাঁদের সংগৃহীত তথ্যাদি পাচার করা হত বিদেশের মাটিতে। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের নজর এড়িয়ে চলা তাঁদের পক্ষে বেশিদিন আর সম্ভব হয়নি। যখন তাঁরা গোয়েন্দা বিভাগের নজর এড়িয়ে বিদেশে পালাবার ফন্দি-ফিকির করছিলেন, তখনই সি বি আই-এর হাতে ধরা পড়েন তাঁরা এবং নিজেরা স্বীকারোক্তি দেন যে তাঁরা মারকিন গুপ্তচর হিসেবে ভারতের মাটিতে কাজ করে এসেছেন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের মাটিতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচর বাহিনীর চূড়ান্ত কার্যকলাপ শুরু হয়েছে ১৯৬০ সাল থেকে। প্রাথমিক পর্যায়ে সি আই এ-র মূল ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল ওড়িশার কটকের কাছে চারবাতিয়া অঞ্চলটিকে। দালাই লামার ভারতে আগমন, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্ট্যালিনের মেয়ের ভারতে ক্ষণস্থায়ী আবাসন, নন্দাদেবী পর্বত শিখরে গোপন যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন সর্বক্ষেত্রেই সি বি আই এ-র মূল কার্যনির্বাহক কেন্দ্র ছিল এই চারবাতিয়া। দীর্ঘদিন চারবাতিয়া ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর নজরের আড়ালে। সম্প্রতি ধরা পড়েছে, চারবাতিয়ার এই সি আই এ পরিচালিত কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আক্রমণের অব্যবহিত পরেই। তারপর থেকে বরাবরই প্রচ্ছন্নভাবে হলেও নির্ভেজালভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সি আই এ-র চর ছড়িয়ে রয়েছে সারা ভারত জুড়ে, বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহরগুলিতে। তাদের একমাত্র কাজ ভারতের বিভিন্ন স্তরের কর্মী এবং অফিসারদের টাকার লোভে বশীভূত করে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে নিজস্ব প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া এবং তারই ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যপদ্ধতি স্থির করা।

সাম্প্রতিক কালে সি আই এ-র কার্যকলাপ সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে মারকিন লেখক স্যামুয়েল হারসের 'প্রাইস অব পাওয়ার' বইটিকে ঘিরে। হারস তাঁর বইতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ভারতের বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই মূলত একজন সি আই এ-র গুপ্তচর। দেশাই অবশ্য হারসের এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়ে চিকাগোর আদালতে হারসের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সি আই এ-র মতই ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আর এক ভীতির কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্তচর বাহিনী কে জি বি। সি আই এ-র মত ভয়ংকর না হলেও কে জি বি-র কর্মপদ্ধতিও ভারতের পক্ষে কম বিপজ্জনক নয়। ভারতে তাদের প্রবেশ সরাসরি ঘটেনি। ভারতেরই প্রতিবেশী রাজ্য ভুটান এবং নেপালে স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলার পরই তারা পা বাড়িয়েছে ভারতের দিকে। সেও ১৯৬২ সালের কথা। তবে একথা ঠিক, কে জি বি-র গুপ্তচরবাহিনী সি আই এ-র গুপ্তচরদের মত ভয়ংকর চক্রান্তে লিপ্ত নয়, অন্তত এখনও পর্যন্ত তার প্রমাণ বিশেষ মেলেনি। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্তচর বাহিনীর মূল কার্যকলাপ সংঘটিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতেই, যেখানে এশিয়া এবং আফরিকার ছাত্রদের বাধ্য করা হয় নিজ নিজ দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হতে।

আসলে কে জি বি-র কর্মপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য হল সেখানেই, যেখানে জনসাধারণের মধ্যে তারা গোপনে কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। কে জি বি-র অফিসাররা শহর গ্রাম সর্বত্র ঘুরে ঘুরে কাজ করে বেড়ান। কখনও সংস্কৃতির নামে, কখনও সমাজসেবার নামে তাঁরা তাঁদের মূল উদ্দেশ্য সাধন করেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর খবর পাওয়া গিয়েছিল, সে সময় অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কে জি বি র প্রভাব ছিল অসামান্য এবং সেই লক্ষ্য সাধনের প্রধান পুরুষ ছিলেন ইউরি ইভশভিচ লিউডিয়নস যিনি ইউরি ইভানোভিচ মোদিন নাম নিয়ে দীর্ঘ ১০ মাস কাটিয়েছিলেন রাজধানী দিললিতে।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের এক গোপন

সমীক্ষায় জানা গেছে, ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে কে জি বি ভারতের ৭০ জন উচ্চপদস্থ আমলাকে গুপ্তচর হিসেবে বেছে নিতে চেয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে ২৫ জনই ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন দূতাবাসের কর্মচারী।

ভারতের গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোরাট থেকে জানা গেছে, ১৯৬০ সালের পর থেকে অসংখ্য সোভিয়েত গুপ্তচর ভারতে সোভিয়েত দূতাবাসের কর্মচারী হিসেবে কাজ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিকোলাই ভ্যাসিলেভিচ আক্সেনভ, এফ নিকোলাই আলেকজানদ্রোভি, ইয়াকভ স্তেপানোউইচ বারসুকভ, ভ্লাদিমির এন নাতুরিন, ইউরি ইয়াকভলেভিচ, ভি পেত্রোভিচ এমন অনেকেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্তচর বাহিনীর কার্যকলাপের এক চূড়ান্ত ঘটনা সাড়া ফেলেছিল ১৯৭৯ সালের প্রথমার্ধে। এবং ঘটনাটি ঘটেছিল কলকাতারই বুকে। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত জনৈক কলকাতা নিবাসী ব্যবসায়ী সি এ মারটিন এবং জনৈক সরকারি অফিসার জোসেফ মহাপুতকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁদের কাছ থেকে বহু গোপন নথিপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছিল বহু বিশিষ্ট ভারতীয়ের তালিকা এবং বহু নথিপত্র সহ একটি রাশিয়ান ক্যামেরা।

ঠিক একইভাবে পাকিস্তানী গুপ্তচরবৃত্তিও ক্রমশ ভারতের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। ভারতের উপদ্রুত এলাকাগুলিতে, বিশেষত জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চলে পাকিস্তানী গুপ্তচরবাহিনীর কার্যকলাপ বিপজ্জনকভাবে প্রসারিত। সম্প্রতি ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের একটি বিমান যখন শিখ ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে লাহোরে অবতরণ করতে বাধ্য হয়, তখন কোন এক গোপন সূত্র থেকে ছিনতাইকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আগ্নেয়াস্ত্র। ভারতের বিভিন্ন মহল থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, ঐ আগ্নেয়াস্ত্র এসেছে পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনীর মাধ্যমেই। তাছাড়া ৫০-এর দশকে জওহরলাল নেহরুকে হত্যার চক্রান্ত তো নির্ভেজালভাবে প্রমাণ করেছে, ভারতের মাটিতে তাদের কার্যকলাপ যে কোন বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীরই সমপর্যায়ভুক্ত।

নেহরুকে হত্যার মূল পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার দায়িত্বে ছিল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ভারতীয় ছাত্র রণবীর সিং শেগাল। সে কাজ করত পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান এন পি রিজভীর তত্ত্বাবধানে। বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা থেকে শুরু করে অন্যান্য বহুবিধ ভারত-বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত ছিল রণবীর। তার সঙ্গে হাত মেলানর অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল হরি দাস, হরভজন দাস, প্রীতেন দাস, জারনেল সিং প্রমুখ আরও কয়েকজন। তদন্তে জানা গিয়েছিল, রণবীর পাকিস্তানী গুপ্তচর হিসেবে ২০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিল। সে নিজে মুখেই স্বীকার করেছিল, জওহরলাল নেহরুকে হত্যার ষড়যন্ত্রে তাকে সাহায্য করেছিল পাকিস্তানের খান আবদুল গফুর খান, এন এ রিজভী, গুলাম হোসেন দত্ত এবং গুলাম ইব্রাহিম।

পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর কার্যকলাপ প্রথম ধরা পড়ে ৫০-এর দশকে। পশ্চিম দিল্লির উদ্বাস্তু পল্লীর শাদিলাল কাপুরকে গ্রেপ্তার করে জানা যায়, সে নতুন দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসের জনৈক অফিসারের নির্দেশে ভারত সরকারের গোপন নথিপত্র সংগ্রহ করত।

১৯৬০ সালের ১৫ ডিসেম্বর ধরা পড়েন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন ক্যাপটেন। অভিযোগ, তিনি পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন। ঠিক একইভাবে ধরা পড়েন বিমানবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি কাজ করতেন পাকিস্তান হাইকমিশনের এম এ আরশাদের তত্ত্বাবধানে।

শুধু পুরুষই নয়, পাকিস্তানী গুপ্তচর হিসেবে পাঞ্জাবে ধরা পড়েছেন বেশ কিছু সুন্দরী মহিলাও। এইসব সুন্দরীরা ভরতের বিরুদ্ধে জঘন্যতম চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।

তারপর ১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৬৮ এমনকি ১৯৭১ সালেও ধরা পড়েছে অনেক পাকিস্তানী গুপ্তচর। এদের কেউ বা কাজ করত সাপুড়ের ছদ্মবেশে, কেউ বা সমাজসেবী হিসেবে। কাউকে কাউকে ভারতীয় কর্মকেন্দ্রে কর্মচারী হিসেবেও পাওয়া গিয়েছে।

সাম্প্রতিককালে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী হাঙ্গামা এবং জম্মু-কাশ্মীরে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের সূত্র হিসেবেও পাকিস্তানকে সন্দেহ করা হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে।

এ সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে যে ভারতের মাটিতে বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীর কার্যকলাপ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এইসব গুপ্তচর বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের ক্ষমতা কতখানি?

ভারতে বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীর প্রমাণিত কার্যাবলী প্রমাণ করে যে সমস্ত কিছুর মূলেই রয়েছে ভারতবাসীরা নিজেরাই। এবং একথাও অনস্বীকার্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কে জি বি (KGB), মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সি আই এ (CIA), গ্রেট বৃটেনের বিখ্যাত এম ১৫ (M15) এবং এম ১৬ (M16), ইজরায়েলের মোসাদ (MOSAD), দক্ষিণ আফরিকার বস (BOSS) বা ইরানের সাভাক (SAVAK)-এর মত দুর্ধর্ষ গুপ্তচর বাহিনীর কাছে ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর নিতান্তই শিশু।

ভারতের গোয়েন্দা দপ্তরকে সাজান হয়েছে তিনটি ভাগে: ১। ইনটেলিজেনস ব্যুরো (IB), ২। রিসারচ অ্যানড অ্যানালিসিস উইং (RAW) এবং ৩। জয়েনট ইনটেলিজেনস কমিটি (JIC)। এর মধ্যে একমাত্র RAW-এর কার্যকলাপ বিদেশের মাটি পর্যন্ত প্রসারিত।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিদেশি গুপ্তচর চক্রের কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র খবরও এই সমস্ত ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তর জোগাড় করতে পারেনি। একমাত্র গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যর্থতার কারণেই কাশ্মীরের কিছুটা অংশ ভারতকে হারাতে হয়েছে পাকিস্তানের কাছে। ৬০-এর দশকে চীনা আক্রমণেরও কারণ ছিল গোয়েন্দা বাহিনীরই ব্যর্থতা।

গোয়েন্দা দপ্তরের বারংবার এই ব্যর্থতার কারণ একটিই – তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব। তাছাড়া দক্ষ কর্মীর অভাবও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। বিদেশি শত্রুর আক্রমণের কথা যদি বাদও দেওয়া হয়, দেখা যাবে, দেশের মধ্যে খোলাখুলিভাবে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার দমনেও এঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ঠিক এই কারণেই বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও ভারতকে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে বারবার। দেশের মধ্যে বিদেশি গুপ্তচর চক্রের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুতগতিতে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের কোণে কোণে। এমনকি এমন অভিযোগও শোনা গেছে, বহু রাজনৈতিক নেতাও সামিল হয়েছেন সেই সমস্ত বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীর কর্মক্ষমতাকে ভারতের মাটিতে আরও ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দিতে।

শ্রীমতী গান্ধীর হত্যার প্রকৃত কারণ কী, তা হয়ত প্রকাশ পাবে না কোনদিনই। যেমন করে প্রকাশ পায়নি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর কারণ, যেমনভাবে ধামাচাপা পড়ে গেছে প্রাক্তন সেনানায়ক সুব্রত মুখার্জির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ।

১৯৭৫ সাল থেকে পরপর চার বার শ্রীমতী গান্ধীর ওপর আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৭৫-এর ১৮ মারচ এলাহাবাদ হাইকোরটে শ্রীমতী গান্ধীর একটি নির্বাচনী আবেদন সংক্রান্ত মামলায় আসার অব্যবহিত পূর্বেই আদালত প্রাঙ্গণে রিভলভার সহ ধরা পড়েন গোবিন্দ মিশ্র নামক এক সাংবাদিক। ১৯৮০-র ১৪ এপরিল বরোদার রাম বালাচাঁদ লালওয়ানি তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করে। তারপর ১৯৮১-র ৩০ ডিসেমবর এবং গত অকটোবর মাসেও তাঁর ওপর আক্রমণ করা হয়। এর কোনটিই ফলপ্রসূ হয়নি ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এতগুলি আক্রমণের ঘটনার পরও ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হয়নি। তাই অকটোবরের শেষ তারিখটিতে তাঁকে প্রাণ দিতে হল তাঁরই নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে।

অচিরেই যদি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর কার্যকলাপকে আরও সুসংগঠিত করে তোলা না যায়, যদি সমস্ত বিভাগকেই নতুন করে সুপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা না যায়, তাহলে হয়ত এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যাবে ভারতের মাটিতে, যার মূল শিকার হবে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ। □

সৃজিত রায়

আলোকচিত্র শংকর নাগ দাস

"আপনারা শুনেছেন কি– আমার ছেলেটি একদিনও স্কুল-কামাই না করার জন্যে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে!

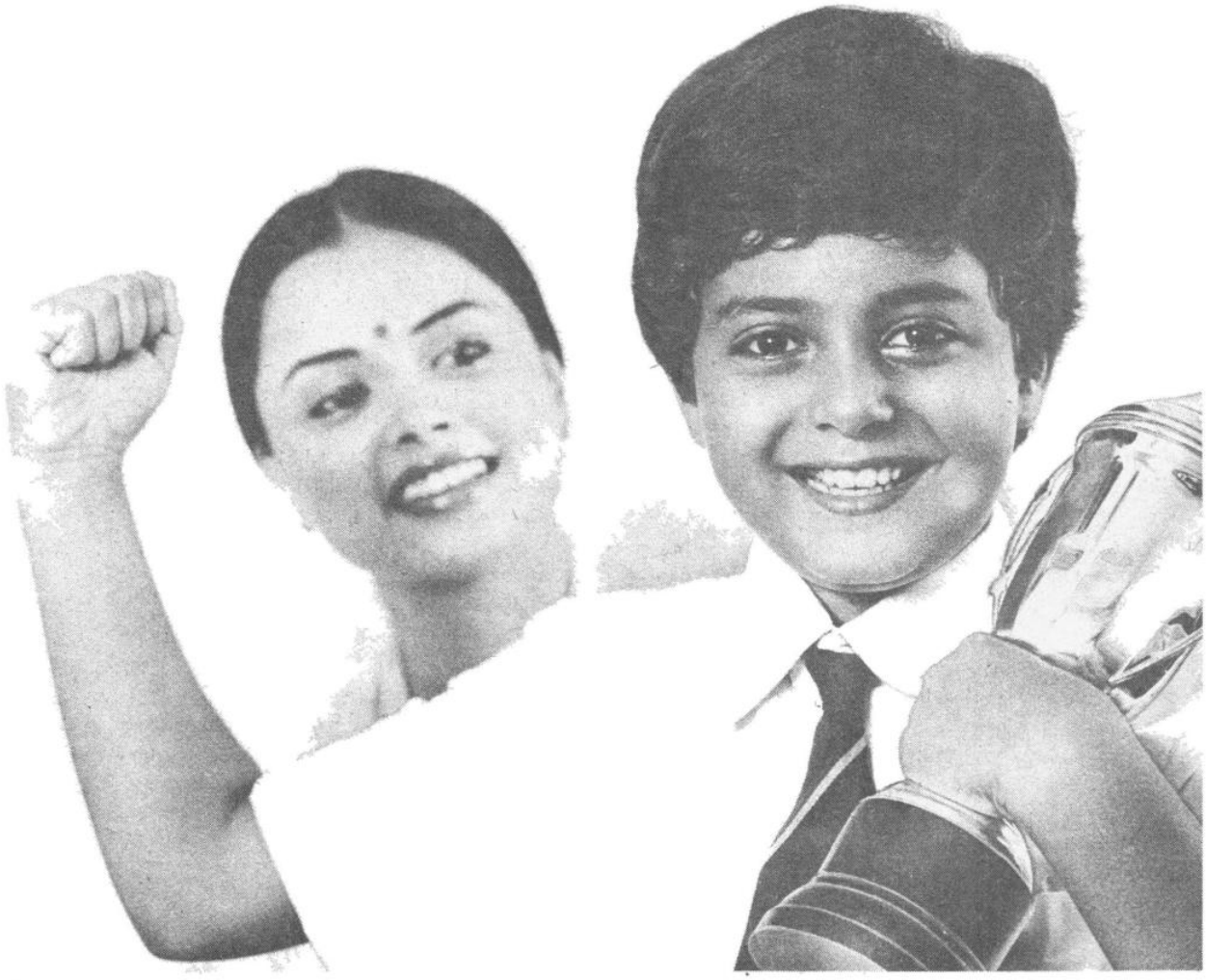

ধন্যবাদ, সেভেন সীজ্!"

আজ্ঞে হ্যাঁ! এঁর গর্বিতা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এঁর ছেলেটি স্কুলে তো রোজ হাজির থাকেই তাছাড়া খেলাধূলো আর পড়াশুনোতেও সে পুরস্কার পেয়েছে। সত্যি, এটা এঁর কৃতিত্বই বটে কারণ ইনি যে ছেলেকে ঠিকভাবে পালন-পোষন করেন। তিনি ওকে দেন পুষ্টিকর আহার আর প্রতিদিন খাওয়ান সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল!

সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল-এর নিয়মিত সেবন— বছরভোর ভাল স্বাস্থ্য রাখার এক **শুদ্ধ** প্রাকৃতিক উপায়! এটির দ্বারা বাচ্চারা ডগ্‌মগে স্বাস্থ্যে বেড়ে ওঠে, ওদের দাঁত ও হাড় হ'য়ে যায় মজবুত আর বর্ষা ও শীতের সর্দি-কাশি থেকে বাঁচার জন্যে শরীরে আসে প্রতিরোধ ক্ষমতা। সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল*— বাচ্চাদের স্বাস্থ্য গ'ড়ে তোলার জন্যে মায়েরা এর ওপরই ভরসা করেন। বিশ্বের ৯৮ টি দেশে ডাক্তাররা এটি সুপারিশ করেন।

* সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল পাওয়া যায় দুই আকারে: ক্যাপসুল আর কমলার মুখরোচক স্বাদের কড লিভার অয়েল টনিক।

সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল বছরভোর সবল স্বাস্থ্যের জন্যে

প্রতিজ্ঞার নবজন্ম

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

১৯৬৬ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হবার পর জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতার ভাষণ দেন সেটি প্রকাশ করা হল:

ছত্রিশ বছর আগে এই বিশেষ দিনটিতে হাজার হাজার কণ্ঠের সংগে আমিও কণ্ঠ মিলিয়েছিলাম স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক প্রাণস্পন্দী শপথ ঘোষণায়।

১৯৪৭ সালে সেই শপথ পূর্ণ হয়েছিল। বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছিল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্দীপ্ত এক নতুন প্রগতিশীল শক্তিকে। জওহরলাল নেহরু যে ১৭ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সমাজ ও ভাষার প্রভেদ সত্ত্বেও দেশের ঐক্য এক বাস্তব রূপ নিয়েছিল। জন্ম হয়েছিল গণতন্ত্রের। অচিরেই সেই গণতন্ত্র জাতির জীবনে শিকড় গেড়ে বসেছিল। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির সাহায্যে আমরা এক উন্নততর জীবন রচনার জন্য সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলাম। নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য ভারতের সোচ্চার সরব কণ্ঠ বহু মানুষের মনে জুগিয়েছিল আশা আর সাহস। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের শান্তি ও মুক্তির বাণী বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী ও ঐক্যের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

শাস্ত্রীজী তাঁর স্বল্প-দীর্ঘ কিন্তু স্মরণীয় নেতৃত্বের দ্বারা তাঁর নিজের মতন করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জাতীয় লক্ষ্যের পথে তিনি ধাবিত হয়েছিলেন দৃঢ় সংকল্প চিত্তে। মাত্র গতকাল তাঁর মরদেহের দগ্ধাবশেষ আমরা পবিত্র নদীর বুকে বিসর্জন দিয়ে এলাম। সমস্ত দেশ এই বিরাট ক্ষতির জন্য গভীর শোকে অভিভূত। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অভাব খুব বড় করে অনুভব করছি, কারণ তাঁর সংগে অনেকদিন আমি কাজ করেছি।

আমি নিজে যে কোন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হই অত্যন্ত বিনীতভাবে। গান্ধীজী ও আমার বাবা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, বিশেষ করে ভারতের জনগণের উপর আমার অসীম আস্থা আমাকে সর্বদা শক্তি ও বিশ্বাস যোগায়। ভারতবর্ষের অদম্য জীবন-রসের প্রমাণ পাওয়া গেছে বার বার। অতীতের মত সাম্প্রতিক কালেও ভারতবর্ষ চ্যালেনজের মোকাবেলা করার মত শক্তি ও সাহস দেখিয়েছে। ভারতীয়ত্বের পিছনে রয়েছে এক শক্ত ভিত্তিভূমি, তা যে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে।

আমাদের সামনের দিনগুলি সংকটাকীর্ণ। আমাদের অজস্র সমস্যা আছে যার দ্রুত সমাধান দরকার। বৃষ্টি হয়নি বলে অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে খরা। যেমন আশা করা গিয়েছিল বিদেশ থেকে তেমন অর্থনৈতিক সাহায্য আসেনি, রফতানি থেকে আয়ও তেমন হয়নি। বিদেশি মুদ্রার অভাবে শিল্প উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এই সব অপ্রত্যাশিত সংকটে আমাদের হতাশ হলে চলবে না। তাদের সাহসের সংগে মোকাবেলা করতে হবে। ভুলভ্রান্তি থেকে আসুন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি, যাতে ভবিষ্যতে

এসব ভুল আর না ঘটে। মাঝে মাঝে আমি আপনাদের সংগে আলোচনা করতে চাই কী কী ব্যবস্থা আমি নিচ্ছি সেই ব্যাপারে। আমি আমার কাজে আপনাদের সমর্থন চাই।

সবার ওপর এই অনটনের বছরে আমাদের জনগণের যাতে খাদ্যাভাব না হয় সেটি দেখা দরকার। এটি সরকারের প্রথম কর্তব্য। আমরা পরিচালনা ব্যবস্থা এবং খাদ্যশস্যের সুষম বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দেব। রেশন ব্যবস্থা, খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যাপারে আমাদের প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য রাজ্য সরকারগুলির কাছে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা চাই। কেরলের মত রাজ্য, যেখানে খাদ্য সংকট লেগেই আছে, আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমরা প্রস্তাব করেছি বাইরে থেকে আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হবে ঘাটতি পূরণের জন্য। আমেরিকার কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ পেয়েছি। তাঁরা আমাদের সমস্যাটা বুঝে দ্রুত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

একমাত্র অধিক উৎপাদনই আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখন আমাদের অনেক ভেবে চিন্তে জল, রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল নানা ধরনের বীজ, কারিগরি উপদেশ এই সব নিয়ে একটা পরিকল্পনা করতে হবে। কৃষির মত এত আত্মবিশ্বাস আর কোথাও দরকার হয় না। এর মানেই হল বেশি উৎপাদন। শুধু দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যই নয়, রফতানির স্বার্থেও উৎপাদন বাড়ান দরকার। আমাদের গ্রামের লোকদের সময় ও কর্মক্ষমতার উপযোগী করে নতুন নতুন পথ বার করতে হবে। তাদের নির্মাণ-কাজে লাগাতে হবে। গ্রামীণ কর্ম প্রকল্পে আমাদের নতুন গতি সঞ্চার করতে হবে। দেখতে হবে যাতে গ্রামের মজুরদের পারিশ্রমিকের হার বাড়ে।

অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে জাতীয় স্তরের কাজকর্মের মতই অভিপ্রায় ও প্রকৃত কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এই ফারাক দূর করার জন্য প্রশাসনের ব্যাপারে যে সব পরিবর্তন ঘটান দরকার সেগুলি ঘটাতে হবে। আমরা নতুন অরগানাইজেশন প্যাটারনের প্রবর্তন করব। ম্যানেজমেনটের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ম্যানেজমেনট টেকনিক প্রবর্তন করব। আমরা সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে বড় রকমের দক্ষতা ও প্রয়োজনীয়তাবোধ আনার চেষ্টা করব এবং এই প্রশাসন যন্ত্রকে ভারতের প্রয়োজনের অনুবর্তী করে তুলব।

আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা বরাবর শান্তির নীতি অনুসরণ করে এসেছি। সমস্ত জাতির সংগে আমরা মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করে এসেছি। কিন্তু তা বলে আমাদের স্বাধীনতা আমরা বিসর্জন দিইনি। আমাদের এই বিদেশনীতি আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুসারী। এই নীতি যথাযথ বহাল থাকবে। আমার বিদেশ সফরের সময় সরকার ও সরকারের বাইরের নেতাদের সংগে আমি দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। সবসময় দেখেছি আমাদের ভূমিকা তাঁদের প্রশংসা অর্জন করেছে। আমার আন্তরিক কাজ হবে শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আমরা প্রতিবেশীদের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যাতে করে সমস্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে। তাসখন্ড ঘোষণা এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। আমরা অক্ষরে অক্ষরে এই চুক্তি পালন করব।

আমাদের লক্ষ্য শান্তি। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী আমি জানি। আমরা তাই সবসময় সতর্ক থাকব, নিরন্তর নজর রাখব, প্রয়োজনমত আমাদের প্রতিরক্ষা বাড়াব।

তারুণ্যের সুযোগ অনেক বেশি। আমাদের তরুণেরা মনে রেখ, তোমরা দেশকে আজ যা দেবে, কাল তাই পাবে। তাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা, তারা যেন উচ্চাশা না হারিয়ে ফেলে, সবাইকে যেন তারা ছাড়িয়ে যায়। বিজ্ঞান ও কলার পৃথিবী, ভাবনা ও ক্রিয়ার পৃথিবী তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নতুন নতুন সীমান্ত তাদের অতিক্রম করতে হবে, নতুন দিগন্তে পাড়ি দিতে হবে, নতুন লক্ষ্যে এসে পৌঁছতে হবে।

আমাদের ধর্ম, ভাষা ও রাজ্য আমাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আমরা একজাতি, একপ্রাণ আসুন আমরা চাষী, মজুর, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মচারী সকলে মিলে নিজেদের শক্তি দেখাই। আসুন আমরা শক্তিশালী হই, সহনশীল হই। সহনশীলতা আর শৃঙ্খলাই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। গতিশীল ও প্রগতিশীল সমাজ ন্যায়পরায়ণ সমাজ যা আমাদের প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা সেটি তখনই সম্ভব হবে যখন কঠোর পরিশ্রম ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আন্তরিক উদ্দেশ্যের পরিমন্ডল গড়ে তুলতে পারব। আজ আমি নতুন করে শপথ নিচ্ছি, সে শপথ হল, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিকল্পিত অর্থনীতি, সামাজিক প্রগতি ও দেশে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শে আমরা অবিচল থাকব।

ভারতবর্ষের নাগরিকবৃন্দ, ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন। আমাদের ভাগ্যকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের শক্তিকে নতুন করে রূপ দিন। এক বিরাট দুঃসাহসিক অভিযানে আমরা সকলে সহযাত্রী। আমরা আমাদের এই মহান দেশের যেন যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠি। জয় হিন্দ। □

কিছু বস্তু জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায়, শতবর্ষ কেটে গেলেও যার বন্ধন অটুট থেকে যায়!

শতবর্ষ আগে হয়েছিল এক পরম্পরার উদয় –
আর ঐ উদয়-সূর্যের উজ্জ্বল ছটা, দুনিয়ার দূর-দূরান্তের
দেশে দেশে ছড়াতেই থেকেছিল..... ঘরে ঘরে,
দিদিমা থেকে নাতনী, সবার কাছে।

সেটি ছিল সানলাইট-এর পরম্পরা – বিশুদ্ধতা ও
কোমলতায় ভরা এই পরম্পরা, যার নিত্য পরিবর্তনশীল
এই যুগও না আজ পর্য্যন্ত পেরেছে কোনো পরিবর্তন
আনতে, আর না তা কোনোদিন পারবে। কারণ,বিশুদ্ধতার
ঐ পরম্পরাকে শত শত বর্ষ ধরে কায়েম রাখার জন্যে
যে আমরা শত কঠিন কাজও হাসিমুখে করতে তৈরী রয়েছি।

সানলাইট সাবান ১০০ বছর ধরে চলে আসছে বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা

LINTAS SUN 11 2116 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

ইন্দিরা-ভাবনা একসূত্রে

সমস্ত মানুষকে যা একসূত্রে বেঁধে রাখে তা ধর্ম, জাতপাত বা ভাষা নয়। এমনকি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও নয়। রাজনৈতিক উপায়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার সচেতন এবং সাবলীল প্রচেষ্টাই সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রাখতে পারে। বর্ণগত, ভাষাগত এবং ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'ভারতীয়ত্বে'র চেতনাই আমাদের দেশের মানুষদের একসূত্রে আবদ্ধ করেছে। জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব বুঝতে না পারার জন্যই পৃথিবীতে বেশিরভাগ দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনা জন্ম নেয়।

* * * * *

জাতি বিদ্বেষ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ দূর করতে ও শান্তি রক্ষা করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভারতীয় ধারণা'ই পোষণ করে। এই ধারণাকে ভিত্তি করেই তারা জাতি সংঘ এবং অন্যত্র আফরিকা-এশিয়ার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছে। গোয়া, কাশ্মীর, বাংলাদেশ প্রভৃতিকে ঘিরে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির যে বিপদ দেখা দিয়েছিল তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। সেক্ষেত্রেও সোভিয়েতের বিশ্লেষণ আমাদের সঙ্গে মিলে গেছে। দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রেও আমাদের দুই দেশের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। আমাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সোভিয়েত ইউনিয়নে রপ্তানী করে ঋণ পরিশোধ করার পর থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কও অনেক সহজ হয়েছে।

* * * * *

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রথম থেকেই ভাল। সেই সময়ে আমেরিকার জনসাধারণ এবং সরকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অধীন দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামে

লিপ্ত জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, বিশেষ করে ভারতবর্ষের প্রতি। যদিও এই অধ্যায়টি ছিল ক্ষণস্থায়ী। বিশ্বের অন্যতম শক্তি হিসেবে পরিগণিত হবার পর থেকেই ভারতের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী জাতীয়তাবাদের প্রতি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই মনোভাব কমতে থাকে। সে সময় সবকিছুই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সাম্যবাদী চিন্তাধারার পরিলক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছিল। সামুদ্রিক সীমারেখা এবং মহাদেশের পরিধি ছাড়িয়ে তখন তারা গড়ে তুলেছিল সামরিক ঘাঁটি। এই নীতির মূলে ছিল পৃথিবীকে দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে দেওয়া। এবং আশা করা হয়েছিল প্রত্যেকটি দেশই কোন না কোন শিবিরের প্রতি নতি স্বীকার করবে, বিশেষ করে পশ্চিমী দেশগুলি।

* * * * *

আফগানিস্তানের সংকট কমবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানর নীতিতেও আমরা বিশ্বাসী নই। কোন গোঁড়ামি বা ইচ্ছেমত ধারণা অথবা সমঝোতায় সামিল হওয়া এই ধরনের জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে না, যে সমস্যাগুলির প্রতিক্রিয়া অতিদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। কোন একক শক্তি একচেটিয়া নীতি বা নৈতিক আধিপত্যের দাবি জানাতে পারে না। বিদেশি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কখনও নিন্দা করে আবার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে কোন দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌছন যায় না। সৌভাগ্যক্রমে এমন একটি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রতি সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা সমস্ত আইনসঙ্গত নিরাপত্তার নীতিকে অঙ্গীভূত করবে।

* * * * *

যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই আধুনিকতম কারিগরী বিদ্যাকে গ্রহণ করতে হবে। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে সাধারণ কারিগরী বিদ্যা বা শারীরিক শ্রম যথেষ্ট নয়। যেমন উপগ্রহের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের ছবি নেওয়া, আবহাওয়ার পূর্বলক্ষণ জানা এবং মরু ও পার্বত্য অঞ্চলে গাছপালার বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি কাজ। অভ্যন্তরীণ নদী-নালায় এবং সমুদ্রে মাছের চাষ সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি করা সম্ভব। মাটি, উদ্ভিদ এবং প্রাণী-শাস্ত্র বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতির আরো উন্নতি প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণও অত্যন্ত জরুরী। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে চাষবাসের ক্ষতি রোধ করা এবং বিকল্প চাষবাসের পদ্ধতিগত পরিকল্পনার উন্নতিসাধনে কমপিউটার বিজ্ঞান অত্যন্ত সহায়ক হবে। কোষতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের সাম্প্রতিক অগ্রগতিও কৃষি, পশুপালন, মাছ চাষ এবং বনাঞ্চলের উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে। এইগুলি এবং অন্যান্য বহু উন্নয়নই কারিগরী ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য সাধনের পথে বেশ কয়েক গুণ এগিয়ে দেবে। □

১। বাবা মায়ের সংগে
২। কংগ্রেস অধিবেশন, ১৯৬৪
৩। নেতাজী ও জওহরলালের সংগে
৪। মসকোর মেট্রোয়
৫। মসকো থেকে বিদায়

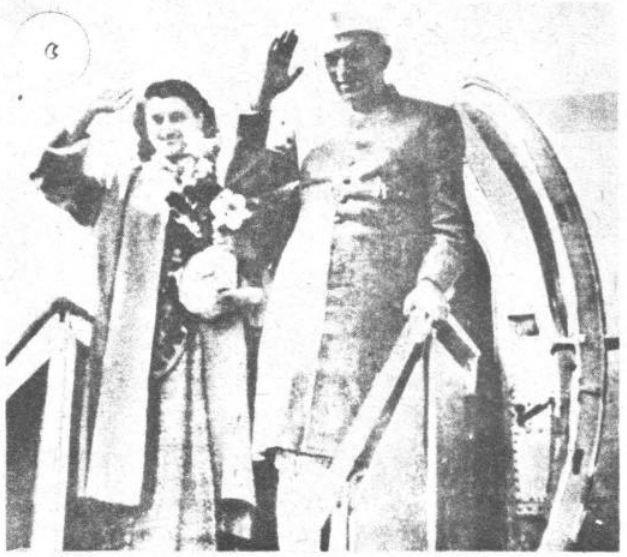

৬। রাজস্থানে

৭। ত্রিপুরায়

৮। একান্ত দর্শক

৯। বস্তারে, আদিবাসীদের মধ্যে

১০। দুই প্রিয় পুত্রের সংগে

১১। প্রণবের সংগে, কলকাতায়

১২। তিহার জেল থেকে বেরিয়ে

১৩। এ আই সি সি, ১৯৬২-র একত্র ভোজে

১৪। পিতামহী ইন্দিরা

১৫। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সংগে

১৬। মুজিব ও সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে
১৭। ভুট্টোর সঙ্গে, সিমলায়
১৮। এরশাদের সঙ্গে
১৯। নেহরু ও রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে
২০। জ্যোতি বসুর সঙ্গে

আলোকচিত্র : সংগৃহীত

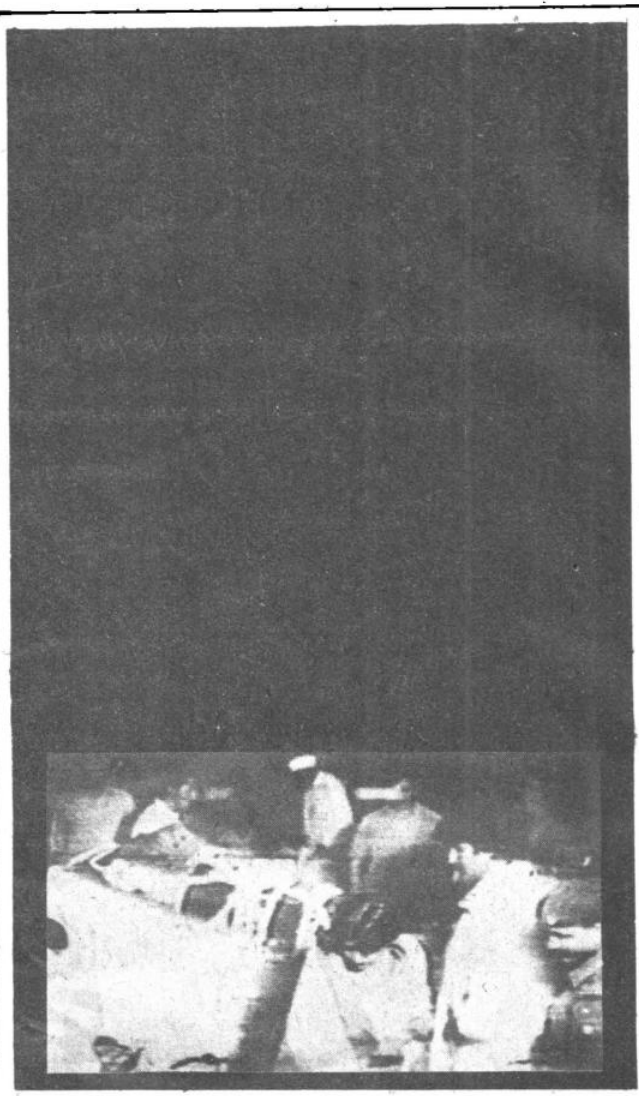

ইন্দিরা হত্যার প্রস্তুতি অনেকদিনের

নয়া দিললি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি

কিশোর মন পত্রিকার গত পূজা সংখ্যায় একজন বিশিষ্ট লেখক একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লনডনে উগ্রপন্থীরা হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা অফিসাররা বিষয়টির উপর তেমন গুরুত্ব দেননি। উপন্যাসে প্রধানমন্ত্রী হত্যার ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু উপন্যাসের এই কল্পিত কাহিনী মাত্র দুমাসের মধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপর সত্যিই আক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাস্তব ঘটনায় সে আক্রমণকে প্রতিহত করা যায়নি।

তথাকথিত খালিস্তানিদের নেতা জগজিৎ সিং চৌহান লনডনে অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর পরিবারকে তাঁরা নিঃশেষ করে ফেলবেন। গোটা পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ষড়যন্ত্র ইতিহাসে নতুন নয়। বিশ্বের যেখানে কূ হয় সেখানে কূ-এর নায়কেরা সর্বাগ্রে চেষ্টা করে শাসক গোষ্ঠীর কেউ যেন বেঁচে থেকে প্রতিশোধ না নিতে পারে। বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকারীরা তাঁর নিরীহ পত্নী ও শিশু পুত্রকেও রেহাই দেয়নি। কেনেডি ভ্রাতৃদ্বয় একে একে দুজনেই প্রায় দিয়েছেন আততায়ীর গুলিতে। ইন্দিরা গান্ধীর গোটা পরিবারকেই ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৩১ অকটোবর ইন্দিরা নিহত হলেন। ঠিক তার আগের দিনই রাজীবের দুই পুত্র-কন্যাকে একটি মাতাদর ভ্যান ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হত্যাকান্ড আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রদের এক সাধারণ প্রথা। এইভাবে তারা বিভিন্ন দেশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়।

মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিক বিদেশি গোয়েন্দা চক্র খুব সূক্ষ্ম কৌশলে হত্যাকান্ড ঘটিয়ে থাকে। মোটর ও বিমান দুর্ঘটনা ঘটান তাদের এক বহু প্রচলিত কৌশল।

১৯৮১ সালের ১৭ এপরিল ভারতীয় গোয়েন্দারা এমন একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ধরে ফেলেন। ওই বছরের ৫ মে শ্রীমতী গান্ধী যে বিমানটিতে করে বিদেশ যাবেন ঠিক করেছিলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা সেই বিমানের মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়ে রাখে যাতে বিমানটি আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনায় পড়ে। ভারতীয় গোয়েন্দারা যদি ঠিক সময় ব্যাপারটি ধরে না ফেলতেন তাহলে ওইদিনই শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যু হত।

এর আগে ১৪ এপরিল পারলামেনটের ভেতর ছুরি নিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে একটি যুবক আক্রমণ করে। কিন্তু ওই ঘটনাটির পিছনে কোন ষড়যন্ত্র নাও থাকতে পারে। কারণ শ্রীমতী গান্ধীকে যারা সত্যিই হত্যা করতে চায় তাদের এমন কাঁচা কাজ করার কথা নয়। তারা পাকা মাথা।

শ্রীমতী গান্ধীকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা বেশ কিছুদিন ধরেই সুযোগের অপেক্ষা করছিল। অনেক ভেবে-চিন্তেই তারা ঠিক করে শ্রীমতী গান্ধীকে হত্যা করার উপযুক্ত জায়গা হল তাঁর বাড়ি। কিন্তু ময়দানে বা তাঁর দফতরে নয় কেন? শ্রীমতী গান্ধী প্রতিদিনই

কোন না কোন জনসভায় বক্তৃতা করতে যান। কিন্তু তিনি যান ভেতরে 'বুলেট-প্রুফ' পোশাক পরে। তাঁর গাড়ির কাঁচও বুলেট-প্রুফ। এছাড়া তাঁকে ঘিরে সব সময় থাকে পদস্থ অফিসাররা। তাঁদের সামনে হত্যাকারী গুলি করলে সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। জনসভায় বক্তৃতা মঞ্চটি পিস্তলের শুটিং রেনজ থেকে বাইরে করা হয়। ইদানীং তাঁর দফতরে পুলিশ প্রহরা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাউথ ব্লকে তাঁর দফতরে যেতে গেলে আগে থেকেই দর্শনপ্রার্থীকে একটি মেটাল ডিটেকটরের মধ্য দিয়ে যেতে হত। গত আগস্ট মাস থেকে সেখানে বারো গজ অন্তর পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রত্যেকটি পুলিশের হাতে ছিল একটি করে ওয়াকি-টকি। রাস্তায় চলমান অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করা মুশকিল ছিল। কারণ তাঁর যাত্রার দু পাশে পুলিশ পাহারা থাকত। তাছাড়া গত কয়েক বছর ধরেই প্রধানমন্ত্রী যে পথ দিয়ে যাবেন, তিনি আসার আগে সেই পথের সমবেত দর্শকদের মুভি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রাখা হচ্ছিল। যাতে কোন ঘটনা ঘটলে ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষকে 'আই-ডেনটিফাই' করা যায়। বলা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী পথে একবার বার হলে নিরাপত্তার সমস্ত আয়োজন হত নিশ্ছিদ্র।

এই জন্য হত্যাকারীরা প্রধানমন্ত্রীর বাড়িকেই হত্যার পক্ষে নিরাপদ জায়গা বলে মনে করে। তারা খুঁজে বার করে দুজন শিখ প্রহরীকে। কারণ ফ্যানাটিক বা ধর্মোন্মাদ কোন ব্যক্তি ছাড়া ঠান্ডা মাথায় ইন্দিরা গান্ধীর মত কোন মানুষকে কোন ব্যক্তি কোটি টাকার বিনিময়েও খুন করতে রাজি হবেন না। যদিও জীবনের দাম এদেশে কিছুই নয়।

প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীর দুই সদস্য সতবন্ত আর বিয়ন্ত সিং। সতবন্ত কনসটেবল। বিয়ন্ত সিং সাব-ইনসপেকটর। দুজনেই দিললি পুলিশের লোক। প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক কারণেই চেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত দেহ-রক্ষীদের মধ্যে যেন শিখরাও থাকে। তাহলে তিনি অন্য শিখদের বলতে পারবেন, 'সমগ্র শিখ জাতিকে আমরা সন্দেহ করি না। আমাদের আক্রমণ শুধু কিছু হঠকারী উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে।' প্রধানমন্ত্রী ঠিক পথই বেছে নিয়েছিলেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বশীল শিখরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। খালিস্তানি আন্দোলন তাঁদের প্রভাবিত করেনি। দিললির

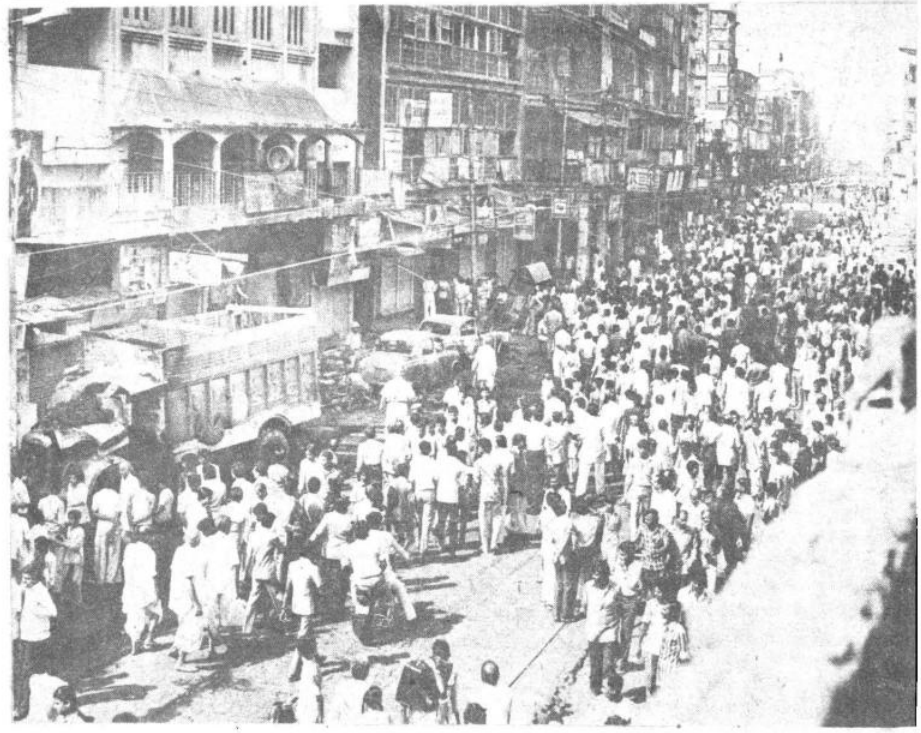

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুকে ঘিরে কলকাতা

কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরগুলিতে কাজ করছেন বহু শিখ। যদি সব শিখ খালিস্তানিপন্থী হতেন তাহলে ভারতবর্ষ অচল হয়ে পড়ত। দেশজুড়ে দেশপ্রেমিক শিখের সংখ্যাই বরং বেশি। সতবন্ত আর বিয়ন্তকে উগ্রপন্থীরা নিয়োগ করেন। তাদের মগজ ধোলাই করা হয়। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসব চলে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু গোয়েন্দারা তা জানতে পারেন না। তাদের বলা হয় এমন একটা সময় খুঁজে বার করতে হবে যখন দিললিতে রাষ্ট্রপতি থাকবেন না, রাজীব গান্ধী থাকবেন না। এই সময় ইন্দিরাকে হত্যা করতে পারলে দেশজুড়ে একটা বিশৃঙ্খলা হবে। তাছাড়া এই হত্যা তো একজনকে দিয়ে হবে না। দুজন দরকার। দুজনের ডিউটিও এক-সঙ্গে এবং পাশাপাশি হওয়া চাই।

ষড়যন্ত্রকারীরা বেছে নিল বুধবার দিনটি। আরও সুবিধা হল শ্রীমতী গান্ধী এদিন সারা সকালটা বাড়িতেই আছেন। তার মানে কয়েকবার ঘর-বার করতে পারেন। অফিস ঘর আর থাকার ঘরের মধ্যে অন্তত চারবার তো যাওয়া-আসা করবেনই। এটাই উপযুক্ত সময়।

প্রধানমন্ত্রীর এনগেজমেনট থেকে ওরা জেনে নেয় সকালবেলা প্রধানমন্ত্রীর টিভি ইনটারভিউ আছে অকবর রোডের বাড়িতে। সফদর-জঙ্গ রোডের বাড়ি থেকে প্রধানমন্ত্রী হেঁটে পাশের বাড়িতে যাবেন। সকাল ন'টা পনের নাগাদ। কিন্তু বিয়ন্ত সিং-এর ডিউটি যে দুপুর দুটো থেকে। সে তখন সকালের ডিউটির লোককে বলে, ভাইসাব, কাল দুপুরে আমার এক আত্মীয় আসছে। তাকে নিয়ে একটু বেরুতে হবে। বড় মুশকিলে পড়েছি। তুমি যদি বিকেলের ডিউটিটা কর। তোমার সকালের ডিউটি আমাকে দাও। সে তখন বলল : ঠিক আছে ভাই। কোই বাত নেই।

বিয়ন্ত সিং সকালে ডিউটি করে নেয়।

সতবন্ত সিং আগের দিন রাত্তির থেকে একটু নারভাস হয়ে পড়েছিল। কী জানি, যদি জানাজানি হয়ে যায়। যদি ধরা পড়ে যায়। এত বড় একটা কাজ। সে তাই ভয়ের চোটে ওইদিন আর সাইকেলে চেপে ডিউটিতে আসেনি। একটা ট্যাকসি করে ডিউটিতে এসেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : কী ব্যাপার, তুমি হঠাৎ ট্যাকসিতে? তাছাড়া তোমায় যেন কেমন কেমন লাগছে। সে বলেছিল, আর বোল না ভাই। কাল রাত থেকে পেট খারাপ। কয়েকবার পায়খানায় গিয়েছি। আমাকে যদি পায়খানার দিকে ডিউটি দাও তো

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

পাত্র-পাত্রী

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকেরা যোগাযোগ করুন। তথ্যকেন্দ্র, ১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলি-১।

(আর-৯৯১৪)

ভাল হয়। অফিসার বলেছিল, এ আর বেশি কথা কী? ঠিক আছে।

সতবন্ত সিং পায়খানার কাছে পজিশন নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বিয়ন্তের ডিউটি ওখানে। এখন দুজন একসঙ্গে হল। গতকাল রাতেই সব কথা হয়ে গিয়েছিল ওদের মধ্যে। এবার শুধু আকারে-ইঙ্গিতে যা কিছু করা।

'৯টা ১৮ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এলেন। তিনি যাবেন আকবর রোডের বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ন্ত সিং-এর রিভলবার গর্জে উঠল। সতবন্ত সিং চালাতে লাগল তার স্টেনগান। মোট ১৬টি গুলি লাগল প্রধানমন্ত্রীর দেহে।'

সতবন্ত সিং-এর বয়স ২১। সে মাত্র দুবছর হল এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে। অনেকদিন ধরেই সে শ্যেনচক্ষু দিয়ে দেখত কীভাবে প্রধানমন্ত্রীকে মারা যায়। রাজীব গান্ধী এটি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাননি।

দুই হত্যাকারী নিশ্চিত ছিল যে তারা পালাতে পারবে না। ধরা পড়বেই। অথবা তারাও মারা যাবে। এ ধরনের হত্যাকারীরা সাধারণত আত্মঘাতী হয়। সাধারণ রাজনৈতিক হত্যা থেকে একে আলাদা করে দেখতে হবে। রাজনৈতিক হত্যায় হত্যাকারীরা নিজেদের পালাবার পথ আগে ঠিক করে রাখে। তারা আত্মহত্যা করতে চায় না। কিন্তু ধর্মীয় বা বর্ণবিদ্বেষের ফলে পাগল হয়ে যখন কেউ এ ধরনের হত্যা করে তখন সে হত্যা করাটাকেই পবিত্র কাজ বলে মনে করে। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সে মাথা ঘামায় না।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে হত্যাকারীদের নিয়োগ করেছিল কারা, না তারা স্বয়ং-নিযুক্ত? স্বয়ং-নিযুক্ত যে নয়, তার প্রমাণ এটি প্রস্তুতিহীন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। গোয়েন্দা পুলিশ সন্দেহ করছে পাঞ্জাব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মান্ধ শিখদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে খালিস্তানপন্থীরা। তাদেরই প্রেরিত এজেন্ট তখন ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয় হত্যাকারী খুঁজে বার করার জন্য। বিয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিং এজেন্টদের খুঁজে বার করা সেই হত্যাকারী। কিন্তু এদের নিয়োগ করা হয়েছিল অনেক দিন আগে থেকেই।

খালিস্তানপন্থীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ভারতীয় প্লেন হাইজ্যাকিং-এর ব্যাপারে প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। অপারেশন ব্লু স্টারের পর প্রকাশিত শ্বেতপত্রে তার কিছু আভাস আছে। প্রধানমন্ত্রী হত্যা ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত যদি হয় তাহলে সেই চক্রান্তের বিশ্বজোড়া জাল ভাল করে উন্মোচিত হবে। □

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য [illegible]

এ কণ্ঠ আর শোনা যাবে না

১৯৮৪ সালের কৃতী বাঙালি নির্বাচিত করুন

১৯৮৩ সালের মত পরিবর্তন ১৯৮৪ সালের কৃতী বাঙালি নির্বাচনের জন্য আপনার সুপারিশ-পত্র আহ্বান করছে। আপনার মতে ১৯৮৪ সালে কোন বাঙালি আপন কৃতিত্বের জন্য জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাঙালির সুনাম বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন? পাঠকদের সুপারিশগুলি আমরা তিনজনের এক বিচারকমন্ডলী দ্বারা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে ১৯৮৫ সালের ২ জানুয়ারি সংখ্যায় ঘোষণা করব ১৯৮৪ সালের কৃতী বাঙালি কে। ১৯৮৪ সালের কৃতী বাঙালিকে পরিবর্তনের পক্ষ থেকে একটি স্মারক উপহার দেওয়া হবে ও তাঁর জন্য এক জনসংবর্ধনার আয়োজন করা হবে।

আজই নিচের ফরমটি পূর্ণ করে পরিবর্তনের ঠিকানায় পাঠান। খামের উপর লিখবেন 'কৃতী বাঙালি ১৯৮৪'।

কৃতী বাঙালির নাম....................

ঠিকানা..............................

ক্ষেত্র : রাজনীতি, অধ্যাপনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সমাজ-সেবা, সমাজনেতৃত্ব। (উপযুক্ত ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন)

১৯৮৪ সালে সর্বভারতীয় অথব্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির বিশেষ অবদানগুলি:

১।

২।

৩।

সুপারিশকারীর নাম.................

ঐ স্বাক্ষর............................

পূর্ণ ঠিকানা..........................

বি: দ্র: এই ফরম ছাড়া মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে না।

ইন্দিরার মৃতদেহ : টেলিভিশনের পর্দা থেকে

হত্যাকারী সতবন্ত সিং মোটেই অনুতপ্ত নয়

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনী এবং সেই সংগে গোয়েন্দা বাহিনীর সুনাম ধূলায় লুণ্ঠিত করেছে। নিশ্চিতভাবে জানা গেছে এতবড় একটা হত্যাকান্ডের চক্রান্ত যে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ভিতরই হচ্ছিল তা তাঁর গোয়েন্দারা আগে থেকে ধরতে পারেননি। এখন জানা গেছে, দুই হত্যাকারী বিয়ান্ত সিং ও সতবন্ত সিং দুজনেই উগ্রপন্থী দলের লোক। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার পরের দিন ১ নভেমবর পুলিশ বিয়ান্ত সিং-এর দিললির বাড়ি সারচ করে একটি টেপ করা ক্যাসেট

পায়। তাতে ছিল ভিনদ্রেনওয়ালার বক্তৃতা। এবং দুটি দশ ডলারের নোট। বিয়ান্ত সিং দিললি পুলিশের একজন সাব-ইনসপেকটর। অসলোতে ভারতীয় আই এফ এস অফিসার হরিন্দর সিং-এর সে নিকট আত্মীয়। হরিন্দর সিং কিছুদিন আগে ভারত সরকারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে খালিস্তানপন্থীদের সংগে যোগ দেন।

শ্রীমতী গান্ধীর দিকে প্রথম গুলিটি ছোঁড়ে বিয়ান্ত সিং। সকালবেলা থেকেই সে নাকি হাতে খোলা পিস্তল নিয়েই পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। বিয়ান্ত সিং-এর বাড়ি চন্ডীগড়। ১৯৭২ সালে সে চাকরিতে যোগ দেয়। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে ছিল। ১৯৮২ সালে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র ক'মাস আগে তাকে আবার নিয়ে আসা হয়। প্রধানমন্ত্রী হত্যার পর পুলিশ বিয়ান্তের দিললির বাড়িতে গিয়ে দেখে বাড়িটি তালা-চাবি দেওয়া। তার প্রতিবেশীরা বলে, চারদিন আগে বিয়ান্তের বাড়ির লোকজন কোথায় চলে গেছে। পুলিশ তখন তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে সারচ করে।

সতবন্ত সিং-এর কাহিনী আরো সন্দেহজনক। তার বাড়ি পাকিস্তান সীমান্ত থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে গুরুদাসপুর জেলার এক গ্রামে। গুরুদাসপুর খালিস্তানপন্থীদের একটি ঘাঁটি। ১৯৮২ সালে সতবন্ত চাকরিতে ঢোকে। প্রথমে ছিল দিললি সশস্ত্র পুলিশের সেকেনড ব্যাটেলিয়নে। সাধারণত চার বছর করে এক একজন সশস্ত্র পুলিশে থাকে। কিন্তু তার আগেই তাকে কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীতে নিয়ে আসা হল সেটাই সন্দেহজনক। জানা গেছে সতবন্ত সিং-এর সংগে কিছু সিনিয়র অফিসারের খাতির ছিল। তাকে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে পাহারায় রাখা হয়। কিন্তু ৩১ অকটোবর তাকে বাড়ির ভেতর ডিউটি করতে দেওয়া হয়। এটাও বা কী করে হল সেটা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সতবন্ত ক'দিন আগে ছুটিতে দেশে গিয়েছিল। দিন তিনেক হল সে ডিউটিতে যোগ দেয়। সতবন্ত সিং এখন আহত অবস্থায় রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে আছে। সে কথাবার্তা বলতে পারছে। পুলিশের কাছে সে বলেছে, আমি গর্বিত যে আমি প্রধানমন্ত্রীকে খুন করতে পেরেছি। আমার গ্রামে আমার এক বন্ধু পুলিশের হাতে মারা গিয়ে শহীদ হয়েছে। আমিও শহীদ হতে চাই।

এদিকে সতবন্তের বাবা তারলোক সিং বাজোয়া (৫৫) পুলিশকে বলেছে, আমার ছেলে প্রধানমন্ত্রীর খুবই প্রশংসা করত। আমার মনে হয় সে কোন বদমাইশ লোকের পাল্লায় পড়ে অমন কাজ করেছে। □

নয়া দিললি থেকে
তরুণপ্রকাশ গংগোপাধ্যায়

সংগঠকদের বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজীবের সভায় গ্রামের মানুষ এসেছিলেন

রাজীব গান্ধীর সফর-সঙ্গী নিশীথ দে

মুরশিদাবাদের নিমতিতা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। এক বিশাল জনতা তখন প্ল্যাটফরম দখল করে রেখেছে। টিকিট ঘরের মাথায়, চায়ের স্টলের ওপর, গাছের ওপর, মগডালে – যতদূর চোখ যায় শুধু কালো-কালো মাথা। শুধু একবার নয়ন মেলে দেখার লোভ, রাজীব গান্ধীকে দেখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে রাজীব গান্ধী। নিমতিতার গাঁয়ের মেয়ে বউ, জোয়ানমদ্দ কজন জানতো যে এই রাজীব কংগ্রেসের একজন নেতা, লোকসভার সদস্য? কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, এই রাজীব আর কয়েক দিন পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।

রাজীব পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে যাবার জন্য। শহর নয়, গ্রামের মানুষের কাছে যেতে চান। সত্যিই তাই। রাজীব গান্ধী সাধারণ মানুষের ভিড়ে, জনসমুদ্রে ডুবে যাচ্ছেন আর খুশিতে যেন, উচ্ছল হয়ে উঠছেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, কিষাণগঞ্জ, মালদহ, মুরশিদাবাদ, সাঁইথিয়া, আসানসোল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কাঁথি....সর্বত্র শুধু জনসমুদ্র। ঢেউ-এর মত আছড়ে পড়ছে গ্রামের হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষ। রাজীবের ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, এতটুকু অস্বস্তি নেই। সব সময় মুখে হাসি লেগে আছে। কতলোক আসছে, মালা দিচ্ছে, ফুল দিচ্ছে। তাঁর সফর সঙ্গীরাও ক্লান্ত হননি, সবাইকে তিনি মাতিয়ে রেখে চলেছেন। হয়ত তিনি বুঝেছিলেন, যে তাঁর যাত্রা শুরু। আরও অনেক পথ চলতে হবে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হবে। সবার আগে চলতে হবে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মনের অঙ্গন দিয়ে। তাই নিরাপত্তার ছকবাঁধা বিধির বাঁধন মানেননি, ছুটে গিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে।

সাংবাদিক জীবনে স্বল্পপথ হলেও প্রয়াত তিন প্রধানমন্ত্রী – জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধীর সফর সঙ্গী হয়েছি। প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীরও সফর সঙ্গী হয়েছি। রাজীব গান্ধী একটু আলাদা।

মুরশিদাবাদ এবং মালদহের গোয়েন্দা পুলিশ সাত দিন ধরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করেছেন। কনভয়-এ কটা গাড়ি থাকবে, গাড়িগুলোর প্রত্যেকটার নম্বর, কটা খোলা গাড়ি, রাজীব গান্ধী খোলা গাড়িতে যাবেন কিনা, বক্তৃতা মঞ্চে কারা থাকবেন ইত্যাদি একরাশ প্রশ্ন নিয়ে জেলা কংগ্রেসের নেতাদের কাছে দৌড়োদৌড়ি করেছেন। শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই বাঁধা নিয়মে চলেনি।

রাজীব গান্ধীর জন্যে আয়োজন ছিল রাজকীয়। কিন্তু সব বৃথা। সাধাসিধে চালচলন। খাওয়া-থাকা সব কিছু সাধারণ কংগ্রেস কর্মীর মত। ইন্দিরা গান্ধীর সফর ছিল ঝটিকা সফর। একদিনে সাত আটটি জনসভা, সাংবাদিক বৈঠক, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা সারতেন সময় সূচির মধ্যে। কিন্তু রাজীবের সফর সূচি সময় সূচির পেছনে পড়ে গিয়েছে। রায়গঞ্জ থেকে গাড়িতে যখন মালদহের গৌড় ভবনে ঢুকলেন তখন রাত বারটা বেজে গিয়েছে। পরের দিন ঘুম থেকে উঠেছেন ভোর না হতেই। সফরের জন্য তৈরি বেলা আটটার আগেই। খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবী পায়জামা আর গলায় সরু পাড়ের সুতির চাদর।

বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শিলিগুড়িতে যাওয়ার পথে রাজীব দুদিকে তাকাচ্ছেন, দুপাশে অপেক্ষমান জনতার অভিবাদন গ্রহণ করছেন, দু হাত জড়ো করে নমস্কার জানাচ্ছেন সবাইকে। সেই সঙ্গে জেনে নিচ্ছেন জায়গার নাম, রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

মালদহ শহর থেকে একটু দূরে, মহানন্দার ওপারে গৌড় ভবনে ২৯ অক্টোবর অসংখ্য লোক এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সবাই কংগ্রেসের লোক নয়, রাজনৈতিক দলের লোক নয়। রাজীব কারোকে ফেরাননি। সংবাদপত্রের ফটো-গ্রাফাররা প্রতি মুহূর্তে ছবি তুলছেন। কোন বিরক্তি নেই।

গৌড় ভবনে বসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখারজি এবং রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরীর সঙ্গে কথা বললেন। দু-এক মিনিট করে কথা বললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মৈত্র, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, আবদুর রউফ আনসারির মত অনেকের সঙ্গে।

গৌড়ভবন থেকে টাউন হল ময়দানে যাবার জন্য গাড়ি সাজান ছিল। রাজীবের জন্যে ছিল খোলা জিপ – সাদা রং তার সঙ্গে লাল বরডার দেওয়া। হঠাৎ সে জিপ বাতিল করে বহাল হল পুরনো একখানা সাধারণ জিপ। রাজীব জিপে দাঁড়িয়ে চললেন। রাস্তার দুপাশে গ্রামের মানুষ। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে গেরস্ত ঘরের বউ এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁত বন্ধ করে পুরুষরা ঝুঁকে পড়েছেন রাস্তায়। 'রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ' ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

মাইল তিনেক রাস্তার দু পাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। সব যানবাহন বন্ধ। কি বিশৃঙ্খলা নেই। রাজীব সবাইকে নমস্কারের বিনিময়ে ভালবাসা গ্রহণ করছেন। এমন অকৃত্রিম ভালবাসা মালদহের মানুষ ইন্দিরাকে জানিয়েছে, সঞ্জয়কে জানিয়েছে। কিন্তু রাজীবকে যেন আরও কাছের মানুষ মনে হয়েছে।

টাউন হল ময়দান প্রকৃত অর্থেই জনসমুদ্র। আশপাশের বাড়ি, রাস্তা, বাসের ছাদ, গাছের ডাল কোথাও বাদ ছিল না। মিটিং শুরু হবার আগে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মালা দেওয়া হল রাজীবকে। নমস্কার জানিয়ে করমর্দন করে মালা নিলেন। আর একটি একটি করে মালা ছুঁড়ে দিচ্ছেন। জনতার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে মালার একটি ফুলের জন্যে। জনতার মধ্যে থেকে আহ্বান শোনা যাচ্ছে, রাজীবজী এদিকে এদিকে, মালা এদিকে ছুঁড়ে দিন।

রাজীব হেসে বলছেন, না, ওদিকে নয়। এবার ওদের দিকে।

জনতার মধ্যে থেকে শোনা গেল, আমি পাইনি, রাজীবজী। রাজীব গান্ধী তখন জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছেন। হাত নেড়ে নেড়ে আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার হবে।

টাউন হল ময়দানে প্রথম বক্তৃতা করলেন প্রণববাবু – আপনারা ভোট দিলেও কংগ্রেস আপনাদের সঙ্গে থাকবে, ভোট না দিলেও কংগ্রেস

আপনাদের সঙ্গে থাকবে। রেলমন্ত্রী বরকত সাহেবের বক্তৃতায় মূলত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সমালোচনা। কিন্তু রাজীব গান্ধীর মিনিট পনের বক্তৃতায় স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের অবদান কতটা তার ছবিটা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে তিনি বোঝানর চেষ্টা করেন, এই মুহূর্তে দেশ এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কংগ্রেসকে এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে কেন সমর্থন করা উচিত। বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হতে চায় ইন্দিরাকে হঠাবার জন্য, কংগ্রেসকে হঠাবার জন্য। বিরোধী দলের কোন কর্মসূচি নেই, লক্ষ্য নেই। কিন্তু কংগ্রেস এগিয়ে চলেছে দেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে।

রাজীব জনসভায়

রাজীবের বক্তৃতায় কোন অবাস্তব আশ্বাস নেই, স্টান্ট নেই। সে জন্য ঘন ঘন হাততালিও পড়েনি। প্রচণ্ড রোদ, ঠাসাঠাসি ভিড়ে জনতা কিন্তু নিবিষ্ট মনে রাজীবের বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত শুনেছেন। বিশাল সমাবেশকে সামাল দিতে পুলিশকে একবারও ছুটোছুটি করতে হয়নি। বক্তৃতার শেষ দিকে রাজীব বলেছিলেন, আপনারা শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। উত্তরবঙ্গে এই দুদিন কত গ্রাম-শহরের মানুষের সঙ্গী হতে পেরেছি। আমি ধন্য, আমি আনন্দ পেয়েছি, আপনাদের আবার নমস্কার জানাই।

মালদহের মানুষ রাজীবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। টাউন হল থেকে স্টেশন – প্রায় মাইল দেড়েক পথ। দু পাশে অপেক্ষমান হাজার হাজার মানুষের ভিড়। সেই জনতাই রাজীবের জন্যে পথ করে দিয়েছেন।

মালদহ স্টেশনে ছিল স্পেশাল ট্রেন। স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে রাজীব আবার বক্তৃতা দিলেন, দু-চার কথায়। বিদায় মালদহ, স্মৃতি নিয়ে গেলেন।

রাজীব ছুটে গিয়ে উঠলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। প্ল্যাট-ফরমে জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ'। রাজীব দরজার কাছে দুই হাত জোড় করে সবাইকে ঘুরে ঘুরে নমস্কার জানালেন। ফরাক্কা ব্রিজ পার হয়ে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল। স্টেশনের প্ল্যাটফরম উপচে পড়ছে জনতার ভিড়ে। দূরে গ্রাম থেকে তখনও মেয়ে-বউরা ছুটে আসছে। চারিদিকে হর্ষধ্বনি আর ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন। আগেই মাইকের ব্যবস্থা ছিল। এদিক থেকে ওদিকে লোক ছুটোছুটি করছে – রাজীব গান্ধী কই, কুনটি, উনি মাইক লিয়ে বুলছেন। কী সোন্দর দেখতে গো, ইন্দিরা গান্ধীর ছেইলে……

রাজীব ততক্ষণে একা-প্ল্যাট-ফরমে নেমে ভিড় ঠেলে ঠিক জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, মাইক নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দূর থেকে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সবাই বলছেন, তোমরা চুপ কর না গো। উনি তো অনেক কথা বলছেন, শুনো না কী বুলছেন।

রাজীবের কিন্তু বিরক্তি নেই। সেই হাসি মুখ। রোদে পুড়ে লাল। তবু ক্লান্তি নেই। মাঝখানে দুপুরের খাওয়া সারলেন চলন্ত ট্রেনে। রেলের ডাইনিং কার থেকে ক্যাটারারের 'থালি'তে চাপাটি-সবজি দিয়ে গেল। কোন স্পেশাল নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ যাত্রীর জন্য বরাদ্দ খাবার।

আবার ট্রেন থামল নিমতিতায়। দ্বিগুণ ভিড়। রাজীব হঠাৎ নেমে পড়লেন প্ল্যাটফরমে। সিকিউরিটির লোকের মাথায় হাত। রাজীব নিজেই ভিড়ের মধ্যে পা-পা করে এগিয়ে চলে এলেন মাঝখানে। ইতোমধ্যে মাইকের সঙ্গে লাউড স্পিকারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাজীব মাউথ-পিসটা তুলে জনতাকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, তার ছিঁড়ে গিয়েছে। কী করে বলব? কেউ শুনতে পাবে না। তার চেয়ে পরে যখন আসব তখন এই গ্রামে আসব। আমি সবাইকে নমস্কার জানাই।

নিমতিতা থেকে থাগড়া ঘাট স্টেশন। প্ল্যাটফরম থেকে রাস্তা অনেক নিচে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আবার সেই খোলা জিপ। বহরমপুরের জনসভা জনসমুদ্র না হলেও, বেশ বড় মিটিং। একের পর এক মালা। রাজীব সেই মালদহের মতই জনতার মধ্যেই ভাগ করে দিলেন। মঞ্চে একটু পিছনের দিকে ছিল বসার আসন। জনতার মধ্য থেকে দাবি উঠল, রাজীবজীকে দেখতে পাচ্ছি না। সামনে থেকে সরে যান। উদ্যোক্তাদের সে দিকে খেয়াল নেই কিংবা আমল দেননি। রাজীব কাউকে কিছু বললেন না। পিছনে রাখা একটা ফোলডিং চেয়ার নিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে পেতে বসে পড়লেন। জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল, হাততালি শোনা গেল। রাজীব তাঁদের হাসি মুখে হাত নেড়ে নেড়ে অভিনন্দন জানালেন।

একজন কিশোর উসখুস করছিল রাজীবের ছবি তোলার জন্য। কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছিল না। রাজীব ইশারা করে কাছে ডেকে বললেন, নাও তুমি ছবি তোল। আমি ঠিকঠাক হয়ে বসছি। দাঁড়াতে হবে? ছেলেটি লজ্জা পেল। বসেই ছবি তুললো – তিন-চারটি ছবি।

সামনে বসে নিচু গলায় সামনের সারির জনতাকে বললেন রাজীব, এটা তো ঐতিহাসিক জেলা। আপনারাই কংগ্রেসের শক্তি। বহরমপুরের বক্তৃতাও মালদহের মতই। কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি দোষারোপ নয়, নির্বাচনী প্রচার নয় মাঝে মাঝে বামফ্রন্টের সমালোচনা করেছেন মাত্র।

বহরমপুর থেকে সাঁইথিয়া, আসানসোল, পুরুলিয়া…… কাঁথির জনসভায় হঠাৎ রাজীবের সেই হাসি যেন কেউ ছিনিয়ে নিল। সেই মর্মান্তিক বার্তা পৌঁছে দিলেন একজন পুলিশ অফিসার। তখন তাঁর পাশে সুব্রত মুখারজি। মুহূর্তের মধ্যে বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। সেখান থেকে চলে এলেন কোলাঘাটে। তারপর হেলিকপটার, বিশেষ বিমানে দিল্লি।

রাজীব এসেছিলেন নির্বাচনী প্রচার চালাতে নয়। পশ্চিমবাংলাকে জানতে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন, সম্পদ, কংগ্রেসের সংগঠনের চেহারা, বামপন্থীদের শক্তি কতটা সব কিছু বুঝতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের নবীন-প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছেন, মানুষ কংগ্রেসকে চায়, কিন্তু কংগ্রেস মানুষের কাছে যেতে পারছে না। কেন পারছে না? কেন? এই প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। সকলের পরামর্শ শুনেছেন। রাজীব একটাই পরামর্শ দিয়েছেন, কংগ্রেসের প্রার্থী করতে হবে তাঁকেই, যাঁর ইমেজ আছে, দুর্নাম নেই, অর্থলোভী নয়। টাকার জন্য যাঁরা কংগ্রেস করেন তাঁদের মনোনয়ন দিলে লোকে ভোট দেবে কেন? যাঁরা দুবার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তাঁদের আর মনোনয়ন নয়। বুদ্ধিজীবী, সৎ, নিষ্ঠাবান, দুর্নীতি-মুক্ত, শিক্ষিত মানুষদের জন্যে কংগ্রেসের আসন ছেড়ে দিতে হবে।

পশ্চিমবাংলা নিয়ে রাজীব ভাবছিলেন, হয়ত সুযোগ পেলে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাতে পারতেন। কিন্তু দেশের এই সংকটে প্রধান-মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে সেই অবকাশ কি পাবেন? □

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

দুষ্টুমিতে ভরা
লিসিয়া ব্রেসিয়ার
৩ বিপ্রদাস স্ট্রীট, কলি ৯
ফোন ৩৫-৬৫৫৭

দশটা-পাঁচটার খাটাখাটুনি, বছরভর রোদে ধূলোয় ঘোরাঘুরি। এর মধ্যেও সুস্থ, সতেজ এই ত্বকের সাথী বোরোলীন।

বোরোলীনের কোমল যত্ন শুষ্কতা আর গা-হাত-পা ফাটা, র‍্যাশ বেরোনো বা রোদে ঝলসানোর থেকে ত্বককে রক্ষা করে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক ক্ষমতা রোজকার সাধারণ কাটা ছড়ায় দারুণ কাজ দেয়।

অফিস পাড়ার সাথী

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

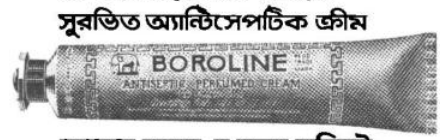

ত্বকের সুরক্ষার জন্য সত্যিই কার্যকরী ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল নিউ আলিপুর কলকাতা ৭০০ ০৮৮

HTC-GDP-5192

জ্যোতিষ-বিচারে ইন্দিরার মৃত্যু প্রায় ঠিক সময়ে হয়েছে

মারকসবাদী জ্যোতিষী নরোত্তম দাস কিছুকাল আগে একটি বাংলা দৈনিকে ভবিষ্যদ্বাণী করেন দুবছরের মধ্যে ইন্দিরার মৃত্যু হবে। তবে তিনি বলেছিলেন, ওই সংকটময় দুবছর শুরু হচ্ছে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি থেকে। এছাড়া গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকাও সতর্ক করে দিয়েছিল 'মহানেত্রীর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনীয়' এই বলে। পরিবর্তন নরোত্তমবাবুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করল।

পরিবর্তন : আপনি কী করে জানলেন যে ইন্দিরা গান্ধী এ বছরই মারা যাবেন?

নরোত্তম সেন : দেখুন, ইন্দিরা গান্ধী এখন শনির দশা এবং মঙ্গলের অন্তর্দশা ফল ভোগ করছিলেন। শনি এবং মঙ্গল উভয়েই একে অপরের মারক গ্রহ। এবং কোন ব্যক্তির একই সঙ্গে এই দুটি গ্রহের যোগাযোগ ঘটলে তার রক্তক্ষয়জনিত মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাই ঘটেছে। জ্যোতিষ মতে এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

পরিবর্তন : কিছুদিন আগে একটি দৈনিক পত্রিকায় আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইন্দিরার এই মৃত্যুযোগ আসছে আগামী জানুয়ারি মাসের পর। এক্ষেত্রে সেই ঘটনার দু মাস আগেই ঘটে গেল কেন?

নরোত্তম সেন : দেখুন, আমরা যখন কোন ব্যক্তির কোষ্ঠী বিচার করি তখন আমরা তাঁর লগ্ন বিচার করেই ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। এক্ষেত্রে জাতক ব্যক্তির কোষ্ঠীতে লগ্নমান দেওয়া থাকে, সেই লগ্নমানের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। যদি জাতক ব্যক্তির লগ্ন মানের ক্ষেত্রে কোন গণ্ডগোল থাকে তাহলে আমাদের গণনাতেও ভুল হতে পারে।

পরিবর্তন : তাহলে আপনি কি মনে করেন ইন্দিরার কোষ্ঠীর লগ্নমান ভুল ছিল?

নরোত্তম সেন : লগ্নমান জ্যোতিষের ক্ষেত্রে এমনই একটা জিনিস যেখানে এক সেকেনড সময় এদিক-ওদিক হলে লগ্নমান নিরূপণ করা খুবই শক্ত। কারণ একটি গ্রহ হয়ত এক সেকেনড আগে অস্ত গেছে। এবং এক সেকেনড পরেই হয়ত অন্য একটি গ্রহের উদয় হয়েছে। সেক্ষেত্রে সঠিক জন্মসময় কোনটি এবং সেই সময় কোন লগ্নের প্রভাব ছিল তা নির্বাচন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তবে ইন্দিরা গান্ধীর কোষ্ঠীর লগ্নমান ভুল ছিল না। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে লগ্নমানের সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কয়েক সেকেনডের ব্যবধান ছিল, তাই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি।

পরিবর্তন : আপনি ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেটা গণনা করলেন কীভাবে?

নরোত্তম সেন : ইন্দিরার নবাংশ চক্রে যে গ্রহ বিন্যাস আছে তা হল – মীন রাশি, মীন লগ্ন, তৃতীয়ে বৃহস্পতি, পঞ্চমে রাহু, ষষ্ঠে রবি, সপ্তমে মঙ্গল, অষ্টমে শুক্র, নবমে বুধ, একাদশে শনি ও কেতু। নবাংশ চক্রের ষষ্ঠে রবি রয়েছে, এই রবিই তাঁকে সারাজীবন যশ ও সম্মান দিয়েছে। কিন্তু সপ্তমে মঙ্গলের প্রভাব থাকার জন্যেই অল্প বয়সে তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর জন্ম কোষ্ঠীতে বৃষে কেতু, লগ্নে শনি, এবং শুক্রে রাহু থাকার জন্যেই তিনি রাজনীতির সর্বোচ্চ পদ পেয়েছেন। এক্ষেত্রে উপরোক্ত ঘটনাগুলি সবই জ্যোতিষের মতে সঠিক হয়েছে। তাই আমিও তাঁর জন্ম চক্র ও নবাংশ চক্র বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

পরিবর্তন : আপনি এই কোষ্ঠী পেলেন কীভাবে?

নরোত্তম সেন : ১৯৬৭ সালে বোম্বাই থেকে একটি জ্যোতিষ পত্রিকা বেরুত। সেই পত্রিকা একবার ইন্দিরার কোষ্ঠী বের করেছিল। আমার কাছেও সেই পত্রিকা আসত। সেই পত্রিকা থেকেই এটা আমি সংগ্রহ করেছি।

পরিবর্তন : আচ্ছা রাজীবের পরবর্তী জীবন কীভাবে কাটবে বলে আপনার ধারণা?

নরোত্তম সেন : আমি এখনো রাজীবের হরসকোপ পাইনি। তবে ইন্দিরা গান্ধীর হরসকোপ অনুযায়ী পুত্রস্থান বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আগামী নির্বাচনে রাজীব গান্ধী হারবেন না নিশ্চয়ই। তবে কেন্দ্রে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাছাড়া ১৯৮৫ সালের পর থেকে রাজীব গান্ধীর সময়ও খুব একটা ভাল যাবে না। প্রায়ই নানান টেনশনের মধ্য দিয়ে সময় কাটবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অর্থনৈতিক সমস্যা, বৈদেশিক নীতি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ তাঁকে বিব্রত করে তুলবে।

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন ভারতবর্ষে যুদ্ধ আসন্ন?

নরোত্তম সেন : দেখুন, ভারতবর্ষের মকর রাশি। আমার মতে, এই দেশ এখন একটা বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তবে ১৯৮৫ সালের প্রথমের দিকে না হলেও ১৯৮৫ সালের শেষ এবং ৮৬ সালের প্রথমের দিকে ভারতবর্ষে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

পরিবর্তন : আগামী বছর (১৯৮৫) সালে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কী হবে?

নরোত্তম সেন : আমার কাছে বামফ্রন্টের যে হরসকোপ আছে সেই হরসকোপ অনুযায়ী বলছি, রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগবে।

পরিবর্তন : জ্যোতিরাবুর ভবিষ্যৎ কী?

নরোত্তম সেন : জ্যোতিবাবুকে চিঠি দিয়েছিলাম হরসকোপ পাঠানর জন্য। কিন্তু উনি পাঠাননি। তবে বামফ্রন্টের হরসকোপ দেখে বলছি, আগামী বার বিধানসভার নির্বাচন হলে জ্যোতিবাবু আবার জিতবেন এবং তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। □

সাক্ষাৎকার :
শিবরাম চক্রবর্তী

ইন্দিরার জন্মকুণ্ডলী

জন্ম – ১৯ । ১১ । ১৯১৭ – এলাহাবাদ
৪১ ঘটি, ৫২ পল এবং ২৩ বিপল, রাত্রি প্রায় ১১টার সময়। (এলাহাবাদের সঙ্গে কলকাতার সময়ের পার্থক্য ২৬ মিনিট।)

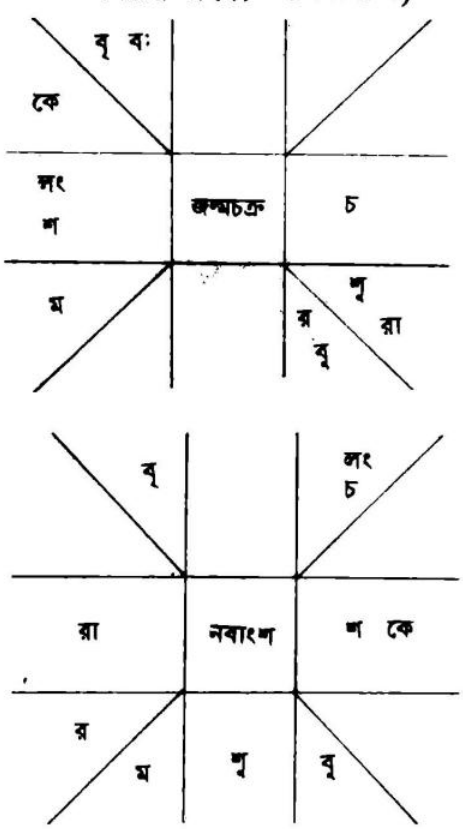

রূপ কথা

ল্যাকমে-র সৌন্দর্য্য সংসার

ল্যাকমের সৌন্দর্যের ঠিকানা

এ পর্যায়ের এবারের লেখাটিতে আমরা আলোচনা করব চুলের ধরন-ধারণ নিয়ে। এই লেখাটিতে আমরা আপনাকে যেসব তথ্য দেব তার ফলে আপনি নিজেই সঠিকভাবে চিনে নিতে পারবেন আপনার চুলের বৈশিষ্ট্যকে। নিজের চুলকে আপনি নিজেই যখন চিনতে পারবেন তখন আমরা এই পর্যায়ের লেখাগুলোর শুরুতেই যে তালিকাটি আপনাকে দিয়েছিলাম তা যথাযথ পূরণ করে ফেলুন। পরে যখন আপনি আরো বিশদভাবে কিছু জানতে চেয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখবেন তখন ঐ তালিকাটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

চুলই হচ্ছে আপনার মাথার আসল মুকুট। মনে রাখবেন, সুন্দর চুলই কিন্তু সবার আগে নজর কাড়বে অনাজনের। কাজেই নিজের চুলকে সাজসজ্জার সঙ্গে মানিয়ে সাজিয়ে তুলতে গেলে সবার আগে আপনার চুলের প্রকৃত রূপটি কী তা আপনার জানা দরকার। আপনার ত্বকের মতই আপনার চুলকেও চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – তেলতেলে, শুকনো, স্বাভাবিক এবং কম পুষ্টিযুক্ত। আপনার চুলের সঠিক প্রকৃতিটি কীভাবে চিনে নেবেন তার জন্য দুটো উপায়ের কথা বলছি।

প্রথমে চুলে শ্যামপু করুন। তারপর ৩৬ ঘন্টা পরে নিজের চুলকে পরীক্ষা করে দেখুন। শ্যামপু করার পর কোন ধরনের চুলের কী অবস্থা হবে তা নিচে দেওয়া হল। এর যেটার সঙ্গে আপনার চুলের অবস্থা মিলে যাবে, জানবেন আপনার চুলের ধরন সেটাই।

শুকনো চুল – শ্যামপু করার পর এই ধরনের চুল হয়ে ওঠে অনুজ্জ্বল, পলকা এবং সহজে একে বাগ মানান যায় না। অনেক সময়ই এই ধরনের চুলের প্রান্তভাগ চেরা থাকে এবং তা সহজে ভেঙে যায়। কারণ, স্বাভাবিক চুলের থেকে এই ধরনের চুল অনেক কম নমনীয় হয়। মাথার খুলিতে যে তৈলাক্ত গ্ল্যানডগুলি থাকে সেগুলো যদি কম কর্যকর হয় তাহলেই চুলের ধরন শুকনো হয়। আবার অনেক সময় কঠিন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি কোন প্রসাধনসামগ্রী কেশসজ্জার ক্ষেত্রে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করলেও চুল হয়ে ওঠে শুকনো।

স্বাভাবিক চুল – শ্যামপু করার পর এই ধরনের চুল হয়ে ওঠে পরিষ্কার, উজ্জ্বল এবং ঢেউ খেলান। মাথার খুলিতে তৈলাক্ত গ্ল্যানডগুলি যথাযথ এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করলে চুলের ধরনও হয়ে ওঠে স্বাভাবিক।

তেলতেলে চুল – শ্যামপু করার কিছুক্ষণের ভেতরই এই ধরনের চুল হয়ে ওঠে নরম এবং চুলে জট বেঁধে যায়। মাথার খুলিতে তৈলাক্ত গ্ল্যানডগুলি যদি অতিমাত্রায় কার্যকর হয়ে ওঠে তাহলেই চুলের ধরনও হয়ে পড়ে তৈলাক্ত। আবার অনেক সময় হরমোনের গোলমালের ফলেও চুলের ধরন তৈলাক্ত হয়। এই ধরনের চুলে খুব সহজেই ময়লা জমে। তাই তেলতেলে চুলকে পরিষ্কার এবং সতেজ রাখার জন্য দরকার ঘন ঘন মাথা পরিষ্কার করা।

কমপুষ্টিযুক্ত চুল – এই ধরনের চুল তেলতেলেও হতে পারে আবার শুকনোও হতে পারে। তবে শ্যামপু করার পর এই ধরনের চুল হয়ে ওঠে নরম এবং অনুজ্জ্বল। প্রকৃতিগতভাবে এই ধরনের চুল খুব দুর্বল। চুলের প্রান্তভাগ থাকে চেরা এবং সহজেই তা ভেঙে যায়। এই ধরনের চুলকে সহজে বাগ মানান যায় না।

আশা করি এবার আপনি আপনার নিজের চুলের ধরন সহজেই চিনে নিতে পারবেন। এবার আমি অন্য কথায় আসি। যখনই আপনি আপনার কেশসজ্জার জন্য কোন বিশেষ স্টাইল বেছে নিতে যাবেন তখন সবসময়ই আপনার চুলের এবং মুখের গঠন সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। প্রত্যেকেই তার চুলের গঠন পায় বংশানুক্রমিকভাবে। একেক জনের চুলের গঠন হয় একেক রকমের। কারো চুলের গঠন হয় খুব সূক্ষ্ম, কারো বা মাঝারি গোছের, আবার কারো হয় রুক্ষ, কর্কশ ধরনের।

সূক্ষ্ম চুল খুব সহজে বাগ মানে না। জলে ভিজলে এই ধরনের চুল খুব নরম হয়ে পড়ে, আঁচড়ে তাকে ঠিকমত সাজান যায় না। এই ধরনের চুলের প্রান্তভাগ চেরা হতে পারে এবং তা ভেঙেও যেতে পারে। এই ধরনের চুল যেমন পাতলা হয়, তেমনি চুলের প্রকৃতিও হয় খুব দুর্বল।

মাঝারি গঠনের চুলকে বাগ মানান অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। এই ধরনের চুল বেশ ঘন হয় এবং একে সাজানও যায় বেশ সুন্দরভাবে।

রুক্ষ, কর্কশ গঠনের চুল হয় খুব পুরু এবং কোঁকড়ান ধরনের। এই ধরনের চুলকে বাগ মানান খুব কঠিন। কারণ এই ধরনের চুল খুব পুরু হওয়ায় সহজে তাতে চিরুনি চলতে চায় না আর খুব কোঁকড়া হওয়ায় সহজে একে সোজা করাও যায় না। যেভাবেই সাজাতে যান না কেন রুক্ষ চুল কুঁকড়ে গিয়ে বিদ্রোহ করবেই।

মনে রাখবেন, পরে যখন আপনি আরো খুঁটিনাটি পরামর্শ চেয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখবেন তখন এসব তথ্যগুলি উল্লেখ করতে ভুলবেন না। খুঁটিনাটি আমাদের জানালে আমরাও আপনাকে আরো ভালভাবে সাহায্য করতে পারব।

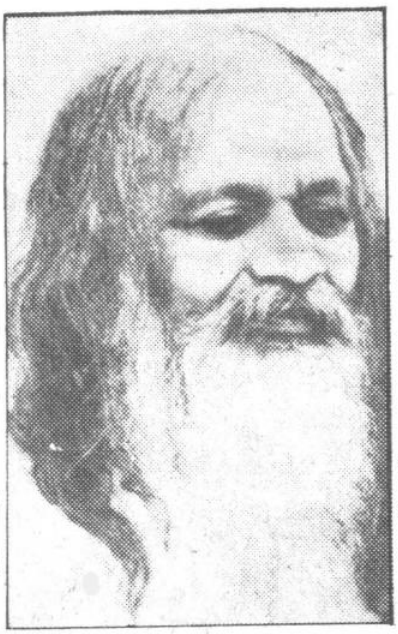

মহর্ষি মহেশ যোগী

অজেয় ভারত যোজনা
রাষ্ট্রীয় কবচ নির্মাণ
বিজয়া দশমীতে পরীক্ষা শুরু

জগত চৈতন্যে শুভ বোধকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে মহর্ষি শৃঙ্খলা ও ধ্যান এবং সৎ চিন্তার ভিত্তিতে যোগ প্রয়োগ করছেন। বহুদেশে এর অলৌকিক ফল অনুভূত হয়েছে। মহর্ষি এবার ভারতকে এমন একটি দেশ করে গড়ে তুলতে চান, যে দেশ সবরকম দুর্যোগ থেকে মুক্ত, যে দেশ আদর্শ এবং অজেয়।

জ্ঞানযোগীর বিশ্ব প্রকাশন এবং অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠক—

তিনি ৪ অক্টোবর ১৯৮৪ তারিখে বিজয়া দশমীর দিনে **অজেয় ভারত** উচ্চারণ করলেন। ভারতকে চিরতরে সবরকম সঙ্কট থেকে মুক্ত করার জন্য এবং তাকে অজেয় করে গড়ে তোলার জন্য বিজয়া দশমী থেকে যোগের স্বর্গীয় প্রয়োগ করা হলো।

মহর্ষি উপলব্ধি করেছেন যে, ভারতকে চিরতরে অজেয় করার জন্য এবং প্রকৃতির সর্বস্তরে—আধ্যাত্মিক, দৈব, ভৌতিক—স্তরে তার অজেয় ভাব জীবন্ত রাখার জন্য যোগের জ্ঞান ও বেদের জ্ঞানকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। যোগের মধ্যে যে গভীর কল্যাণ বোধ রয়েছে এবং বেদের যে দৈব শক্তি রয়েছে তা একত্রিত হয়ে ভারতকে চিরদিনের জন্য প্রতিভার ক্ষেত্র করে তুলবে।

যাঁদের অস্ত্রের দৈব ব্যবহারের নীতি সম্পর্কে জ্ঞান আছে, **জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বেদ ও স্তোত্রের জ্ঞান** আছে, যথাযথ সময়ে ব্যবহারের জন্য তাঁদের আমরা তাঁদের জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য ও প্রবন্ধ পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিষয় হলো :

বৈদিক সাহিত্যে বিজয় নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা, দৈব অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ বিজ্ঞান, স্তোত্র, সিদ্ধতন্ত্রের ব্যবহার। এসব বিষয়ে বিশারদরা অবিলম্বে তাঁদের মন্তব্য এবং রচনাদি পাঠাতে পারেন।

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লেখককে নগদ ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যাঁরা ভারতকে চিরতরে অজেয় করার জন্য আজীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চান, যাগ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও গবেষণা চালিয়ে যেতে চান তাঁদের অজেয় ভারত নির্মাতা হিসাবে সম্মানিত করা হবে। এরকম ৭০০০ অজেয় ভারত নির্মাতার জন্য অজেয় ভারত স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এবং যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব যথাযথভাবে চালনার জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মহর্ষি মনে করেন যে, ভারতীয় মানসের ওপর তাঁর **যোগের সৎগুণী ফলশ্রুতি বজায় রাখার জন্য ভারতীয় জ্ঞানের সমবেত ব্যবহার আবশ্যিক।**

এই পরিকল্পনাকে সুদৃঢ় করার জন্য **আমাদের দেশের সচ্ছল সম্প্রদায়কেও** সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসা দরকার। এই সমস্ত বৈদিক যাগ-যজ্ঞ থেকে যে একতার সৃষ্টি হবে তা **ধর্ম, মোক্ষ, কাম, অর্থ**-এর ঐশ্বরিক শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবে।

যেসব বৈদিক পণ্ডিত, ধ্যানী, যোগ-বিশারদ তাঁদের দেশ সম্পর্কে গর্বিত এবং যাঁদের দৈব শক্তিতে বিশ্বাস আছে এবং যাঁরা মহর্ষির অজেয় ভারত অভিযানের মধ্যদিয়ে তাঁদের মাতৃভূমিকে সঙ্কটমুক্ত করতে আগ্রহী, তাঁরা তাঁদের আগ্রহের বিষয় লিখে জানান।

এসব সংগ্রহ এখনই করা দরকার। কারণ তাহলেই, যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হবে তা সমাধানের জন্য এদের ব্যবহার করা সম্ভব হবে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন,

'হেয়ং দুঃখমনাগতম্

যোগের বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান, বেদের বিজ্ঞান কল্পনাতীত এবং সর্বাধিক শক্তিশালী।

পণ্ডিতদের এগিয়ে আসা দরকার এবং নিজের দেশকে এমন শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে তোলা দরকার যাতে পৃথিবীর সব দেশই শান্তিতে বাস করতে পারে।

আজকের দিনে দেশের রাজনীতিক, অর্থনীতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা দৈব নির্দেশের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে—

কা চুপ সাধি রহেহু বলবানা'
কাল্হ করৈ সো আজকর আজ করৈ সো অব।
পল মেঁ পরলয হোয়গী বহুরি করৈগো কব।'

আপনাদের মধ্যে যাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে দৈব পরীক্ষা নিরীক্ষার ঐতিহ্য আছে তাঁদের সে অভিজ্ঞতাকে ব্যবহারিক ভাবে ও গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সময় এসেছে। যাঁরা দৈব পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণা করতে চান, তাঁরা আমাদের তা জানাতে পারেন।

যোগের সর্বোচ্চ স্তরে মহর্ষির যে দখল আছে, তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ব্যক্তিক এবং সামাজিক জীবন বিপদমুক্ত করা যেতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে মহর্ষি বিশ্ব প্রশাসন (১৯৭৫) প্রতিষ্ঠা করেন। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যে দিন মহর্ষির বিশ্ব প্রশাসনের ফলে ভারত তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে এবং সে আবার হবে বিশ্ব শিক্ষক। আমাদের দেশে যে দুঃখজনক রাজনীতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা চলছে তার অবসান ঘটবে। দিনের আলোয় যেমন অন্ধকার সরে যায়, তেমনি সমস্ত দেশের মধ্যে সৎগুণ (সততা) বৃদ্ধির জন্য স্কুলে যৌথ ভাবাতীত ধ্যান (চিন্তার মধ্য দিয়ে ধ্যান) সাফল্যলাভ করেছে। দেশে সৎগুণের বৃদ্ধি হলে, দেশের ভিতরের বা বাইরের কোন শত্রু থাকবে না। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে, স্কুলের ছুটির সময় সমবেত ধ্যানের ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে

রজগুণ, তমোগুণ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দীপ নিভে গেলেই শুরু হয় অন্ধকারের রাজত্ব। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে অন্তত ৭০০০ লোক ভারতকে অজেয় করার সঙ্কল্প নিয়ে সর্বদা ধ্যান এবং দৈব অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে কিনা। জয়ের জন্য আমাদের ব্যবহারিকভাবে দৈব অস্ত্র—**আগ্নেয় অস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র, ব্রহ্ম অস্ত্র**-কে প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে লাগাতে সক্ষম হতে হবে। সুতরাং অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে।

এ জিনিস প্রচারের জিনিস নয়। কিন্তু একথা স্পষ্ট ভাবে বলা দরকার যে, যখন দেশের লোকেরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, তখন তাঁরা যাতে বিহ্বল না হন, তার জন্য এটা করা দরকার।

বেদের নিদান শাশ্বত। সুতরাং পবিত্র প্রকৃতিকে তাদের সব সময়ই চিহ্নিত দেখা যায়। মন যখন অন্য চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে তখন মনে তাদের উদয় হওয়ার বাধা থাকে না—

যা জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে ' ঋগ্বেদ–

ভারতীয় মানসে বেদ সর্বদা বিকাশমান। যে কোন সময়ই তাকে কাজে লাগানো যায়। অজেয় ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য দৈব শক্তিকে কাজে লাগানোর সময় এসেছে।

অজেয় ভারতের সকল্প নিয়ে এখনই দৈব প্রয়োগের প্রয়োজন। কারণ ভিতর বা বার কোন দিক থেকেই দেশ এখনও যথেষ্ট সুদৃঢ় নয়। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা বর্তমানে পর্যাপ্ত নয়। কোন দেশই এখন কেবল ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও আণবিক শক্তির ওপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। একটা দেশ হয় তো আর একটা দেশকে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। বৈজ্ঞানিক যুগে কেবল দৈব অস্ত্রের সাহায্যেই একটা দেশ আত্মরক্ষা করতে পারে। এই বিজ্ঞানের যুগে ধ্বংসের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য বেদে উল্লিখিত দৈব অস্ত্রই রয়েছে।

সত্যমেব জয়তে বেদের এই প্রাচীন নীতিই হলো বিজয়ের অভ্রান্তনীতি। এই নীতিকে বুঝতে হলে জাতীয় চৈতন্য সৎগুণী গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। দেশকে অজেয় করার এই হলো উপায়। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবারকে এই অভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে। নিজের জীবনে এই নীতিকে উদ্বুদ্ধ করার সহজতম পন্থা হলো নিয়মিত **ভাবাতীত ধ্যানের** অভ্যাস। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন : নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ' গীতা – ২/৪৫ এবং তার ফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, **নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান।** কেবল **ভাবাতীত ধ্যানের** নীতির মধ্য দিয়েই জাতীয় চৈতন্যকে সৎগুণী করা যায়। বস্তুত দেশকে অজেয় করার এটিই একমাত্র পন্থা।

দিল্লির **মহর্ষি বেদ বিজন বিদ্যাপীঠে** প্রায় ১৫০০ জন ছাত্র সকালে বিকালে যৌথ ভাবাতীত ধ্যানে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। সন্ধ্যেমের (শৃঙ্খলা) সময় তাঁদের আসন উঁচুতে ওঠে এবং সৎগুণী ভাব চারদিকে বিরাজ করতে থাকে মনে হয়এর ফলেই পাঞ্জাবের বিধ্বংসী আগুনের হাত থেকে দিল্লি বেঁচে গেছে।

অকল্পনীয় হলেও কয়েকটি দেশে যৌথ ভাবাতীত ধ্যানের ফল সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে **ফিলিপিন্সের কায়াকল্প ঘটেছিল।** সেদেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা পাল্টে গেছে। মহর্ষি বলেছেন—দৈবের সহযোগিতায় কী না সম্ভব হয়।' যৌথ ভাবাতীত ধ্যানের তত্ত্বের ভিত্তির প্রভাবে মহর্ষির বিশ্ব প্রশাসন যে সত্যিই সম্ভব তা পৃথিবীর অনেক স্থানে এবং ভারতেও কোথাও কোথাও দেখা গেছে।

ভারত দেশটা বিশাল এবং এর জনসংখ্যাও বিপুল। রাষ্ট্রীয় চেতনাকে দুর্বল করার জন্য নানারকম প্রবৃত্তি কাজ করছে। এ থেকে নিষ্কৃতির একটিই পথ। দেশের সর্বত্র, প্রতিটি স্কুল, কলেজ এবং প্রত্যেক পরিবার সকালে ও সন্ধ্যায় **সমবেতভাবে ১৫ মিনিট কাল ধরে ভাবাতীত ধ্যান অভ্যাস করতে হবে।** ভাবাতীত ধ্যান মহর্ষির বেদ বিজ্ঞান ক্ষেত্রের অমোঘ পদ্ধতি-এতে প্রাতিস্বিক জীবন এবং সামূহিক জীবন সদ্‌গুণান্বিত হয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে অপরাজেয় ক'রে তোলা যায়। ঋগ্বেদের ' **সমিতিঃ সমানী** তত্ত্ব দেশকে সর্ববিধ অন্তর্কলহ ও বৈদেশিক সমস্যামুক্ত করার ক্ষমতা রাখে এবং বিশ্বশান্তি স্থাপন করতে পারে।

গত জানুয়ারি মাসে মহর্ষি ৭০০০ জন ভাবাতীত ধ্যান ও সংযমের কুশলী আহ্বান করেন (বিশ্বের মোট জন সংখ্যার ১% বর্গমূল) এবং সম্পূর্ণ বিশ্বচেতনার উদ্দেশ্যেই **মহর্ষি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে** ধ্যান প্রচেষ্টার আয়োজন করেন (১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ থেকে ৬ জানুয়ারি ১৯৮৪)। ওই ২১ দিন ব্যাপী সামূহিক ধ্যান প্রয়োগের ফলেই বিশ্ব জোড়া সদ্‌গুণের এক নতুন জোয়ারে পৃথিবী প্লাবিত হয়। এই প্রচেষ্টাকারীর যদি যজ্ঞেও পারদর্শী হ'তেন তাহলে, যে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল তার সৎ-প্রভাব ঢের বেশি গভীর ও ব্যাপক হ'ত এবং ভারতে যেসব অবাঞ্ছিত ও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে সেগুলি আদৌ হ'ত না।

जबसे चेते तबसे सही।
बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेहि।

৭০০০ জনের সামূহিক পরীক্ষার ওপর ভিত্তি ক'রে যোগ বেদ বিজ্ঞানের স্থায়ী সামূহিক যোগ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সংকল্প নিয়েছেন মহর্ষি এবং সেই যোগের সদ্‌গুণী ফল এবং বেদের অলৌকিক শক্তি—এই দুই-ই মিলিয়ে জাতিকে চিরতরে অজেয় করবে এবং বিশ্বচেতনাকে পবিত্র করবে।

ভারত যে পৃথিবীর গুরু ভারতের এই গৌরব সম্পর্কে প্রত্যেকের সচেতন থাকা প্রয়োজন। ভারত যুগে যুগে সন্ত, মহাত্মা এবং বিদ্বান ও সিদ্ধ পুরুষের জন্ম দিয়ে এসেছে এবং জগদ্‌গুরুর আসনটি অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছে। তাঁদের ধ্যান ও সাধনা কালের চক্রকে অগ্রগতির পথে চালনা করে চলেছে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ঐতিহ্য সজীব রেখেছে এবং বিশ্বের পথ প্রদর্শন অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গত কয়েক শতক ধরে বিজ্ঞান বেদকে আচ্ছন্ন করে রেখে ছিল। সেই দুঃসময় সমাপ্ত হয়েছে এবং বেদের জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং জ্ঞানযুগের উদ্বোধন ঘটেছে। **এখন এ দেশে ও সারা বিশ্ব জুড়ে সদ্‌গুণ প্রভাব বিস্তার করে সকলের মঙ্গল সাধন করবে।**

বৈদিক সাহিত্যে যে জতীব জটিল যোগের তত্ত্ব বিধৃত আছে তাকে বিশ্বময় প্রতিফলিত করে সদ্‌গুণ সচেতন করার উদ্দেশ্যেই মহর্ষি ভারতে এবং সারা বিশ্ব জুড়ে যোগ পরীক্ষা-প্রক্রিয়া পরিচালনা করছেন। বেদ বিদ্যাই এই দেশকে বর্তমানে এবং অনন্তকাল অজেয় করতে সক্ষম।

যোগে মহর্ষির সম্পূর্ণ সিদ্ধি এবং কয়েকটি স্থানে বিশ্বচেতনতাকে সফল ভাবে সদ্‌গুণান্বিত করা দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্ব চেতনাকে চিরকালের জন্যই সদ্‌গুণসম্পন্ন করা সম্ভব শ্রীঅরবিন্দেরওএই ইচ্ছা ছিল : Descent of Supra-mental Power on Earth.– অর্থাৎ অতিমানস শক্তির উদ্বোধন হোক। এককভাবে ভাবাতীত ধ্যানের সর্বাত্মক সাধনা দ্বারা প্রাতিস্বিক জীবন সফল হয় এবং সমবেতভাবে করলে সামাজিক শুদ্ধি ঘটে। এতদ্দ্বারা প্রকৃতি হয় পবিত্র এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত ভারতকে অজেয় করার উদ্দেশেই এর প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এই অজেয় ভারত যজ্ঞের একটি অংশ হ'ল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভাবাতীত জ্ঞানের অনুশীলন। এর জন্য প্রতিটি ভালো বিদ্যালয়ে অন্তত একজন করে ভারতীয় ধ্যানের শিক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যিক। তার ফলে বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বে এই সদ্‌গুণাবলীর প্রভাব বিস্তারিত হবে এবং সমাজে সদ্‌গুণাবলীর প্রবলতা অবিচ্ছিন্ন থাকবে।

এই যজ্ঞের দ্বিতীয় অংশ হল নিয়মিতভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা **একটি স্থানে যোগ ও বেদ বিদ্যায় পারদর্শী ৭০০০ জন ব্যক্তি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যাপন করে সব কিছু করতে সক্ষম হন তাহলে তাঁরা সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বচেতনাকে সর্বদাই সদ্‌গুণী করতে পারবেন।**

ভারতীয় বেদ বিজ্ঞানের প্রতিফল হিসেবে বিশ্বের প্রতিটি দেশ সুস ংগঠিত এবং সদগুণী হয়ে চলতে থাকবে তাতে কোন সংশয় নেই। ভারতীয় চেতনা অবশ্যই চিরকাল সদ্‌গুণান্বিত হয়ে থাকবে এবং রাষ্ট্র অজেয় হয়ে উঠবে।

এই নীতি প্রাচীন বৈদিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত—

अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत।

ঋগ্বেদ – ১/১/২

চৈতন্যের প্রতীক অগ্নি সর্বদাই প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের দ্বারা পূজিত হয়েছে। আধুনিক বস্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একে বুঝতে হলে ভাবাতীত ধ্যানে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে তার ফলের দিকে একবার তাকাতে হবে। (যা Scientific Research on Transcendental Meditation and Siddhi Programme. Maharishi Technology of Unified Field বইতে পাওয়া যাবে।)

শাশ্বত এবং সর্বশক্তিমান বৈদিক বিজ্ঞানের অভ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে ছাত্রদের প্রতি বছর যে ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে **'অজেয় পর্ব'** অনুষ্ঠিত হয় ঠিক সেই ভাবে **অজেয় ভারত মহাসঙ্কল্প**-এর মহান প্রস্তাব দিয়ে শুরু করতে হবে। **ভারতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র অদৃশ্য দৈব প্রভাবের আশীর্বাদে ধন্য হবে। আশীর্বাদ পাবে ভারতের প্রতিটি গৃহ। ভারত মাতার কাছ থেকে পৃথিবীর কাছে এটি হবে একটি পুরস্কার**—"শুভম ভূয়াৎ"

কবি ও লেখকরাও রচনা পাঠাবেন।

ডাকের ঠিকানা

১। **অজেয় ভারত অভিযান**
মহামহোপাধ্যায় আচার্য রামবিলাস শুক্লা
শঙ্করাচার্য নগর, হৃষিকেশ (ইউ· পি·)
পিন কোড-২৪৯৩০৫

২। **অজেয় ভারত অভিযান**
ডঃ রামকুমার বর্মা
সাকেত-৪, প্রয়াগ স্ট্রিট, এলাহাবাদ (ইউ· পি·)
পিন কোড-২১১০০১

৩। **অজেয় ভারত অভিযান**
মহর্ষি বেদ বিজ্ঞান বিদ্যাপীঠ
পোস্ট বক্স নং ৭০২০, দিল্লি
পিন কোড-১১০০৬৫

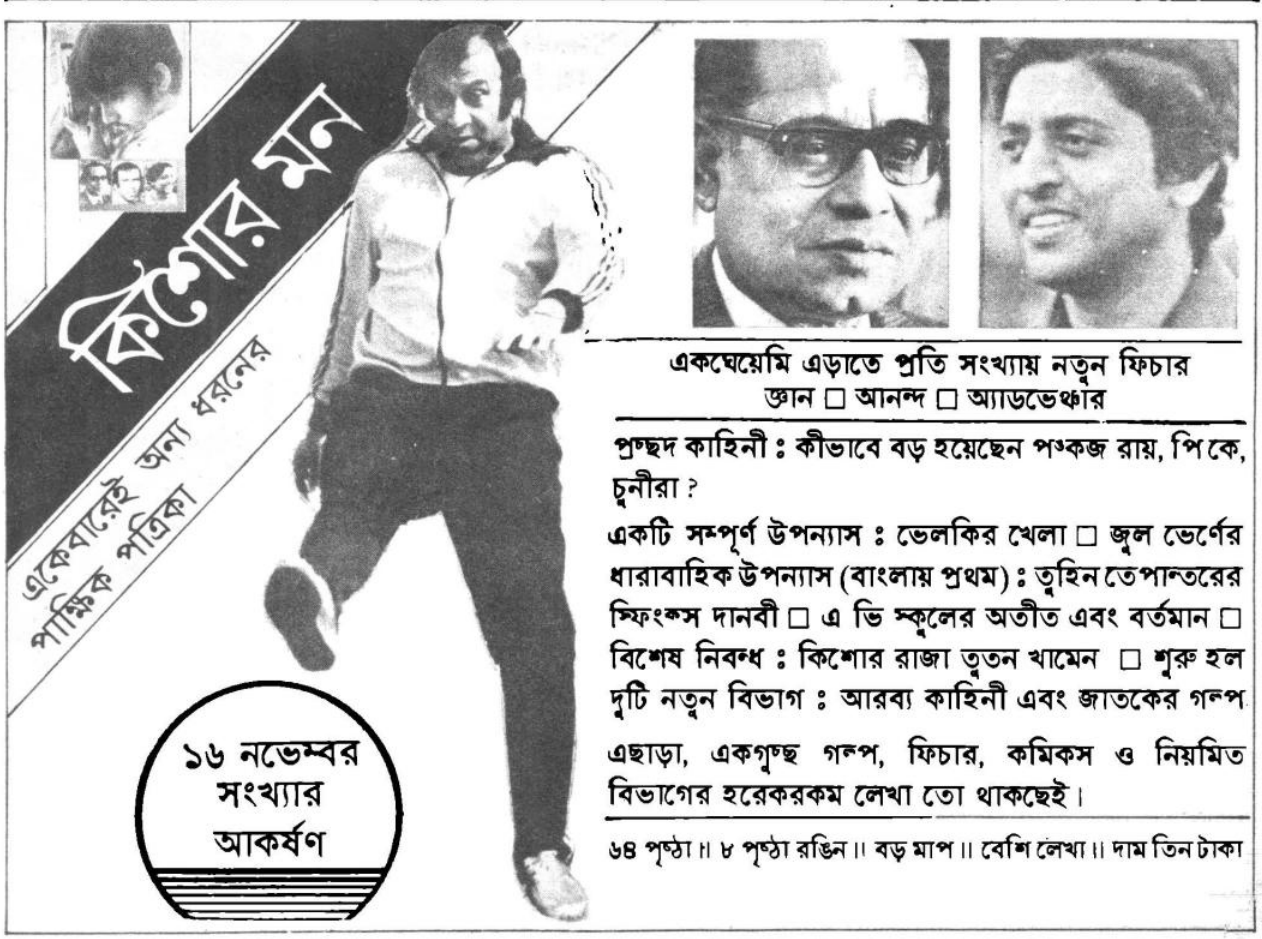

একঘেয়েমি এড়াতে প্রতি সংখ্যায় নতুন ফিচার
জ্ঞান □ আনন্দ □ অ্যাডভেঞ্চার

প্রচ্ছদ কাহিনী : কীভাবে বড় হয়েছেন পংকজ রায়, পি কে, চুনীরা ?

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস : ভেলকির খেলা □ জুল ভের্ণের ধারাবাহিক উপন্যাস (বাংলায় প্রথম) : তুহিন তেপান্তরের স্ফিংক্স দানবী □ এ ভি স্কুলের অতীত এবং বর্তমান □ বিশেষ নিবন্ধ : কিশোর রাজা তুতন খামেন □ শুরু হল দুটি নতুন বিভাগ : আরব্য কাহিনী এবং জাতকের গল্প

এছাড়া, একগুচ্ছ গল্প, ফিচার, কমিকস ও নিয়মিত বিভাগের হরেকরকম লেখা তো থাকছেই।

৬৪ পৃষ্ঠা ।। ৮ পৃষ্ঠা রঙিন ।। বড় মাপ ।। বেশি লেখা ।। দাম তিন টাকা

খেলার আসর

৯ নভেম্বর সংখ্যার আকর্ষণ

সেই ১৯৬৯ সালে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল মহিন্দর অমরনাথের তার পর এই দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে কখনও তিনি ভারতীয় দলে অপাংক্তেয়, কখনও দলের অপরিহার্য খেলো য়াড়। যখনই মনে হয়েছে 'জিমি ফুরিয়ে গেছেন' তখনই নাটকীয়ভাবে তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে এবং একবার নয়,তিন তিনবার, এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী :

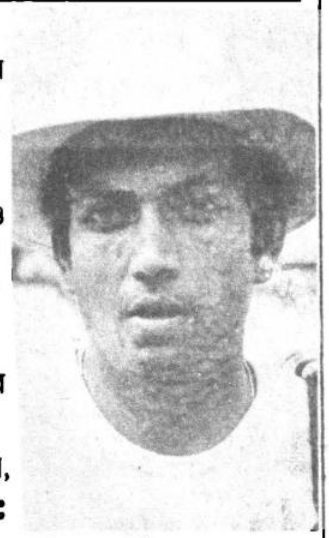

মহিন্দরের প্রত্যাবর্তন

সঙ্গে ফয়সালাবাদ টেস্টের রিপোর্ট

ভারত যদিও এশিয়ান কাপ ফুটবলের মূল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে, তবু অধিকাংশ ফুটবলানুরাগীই ভারতীয় দলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভাব অনুভব করছেন এবং মনে করছেন ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে এ আই এফ এফ এবং মনোরঞ্জনের মধ্যে একটা সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন। তাই নিয়ে এবারে বিশেষ রচনা।

ভারতীয় দল ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

দারুণভাবে আই এফ এ শিল্ড জেতার পর দার্জিলিং গোল্ড কাপে ইস্ট বেঙ্গল কেন ব্যর্থ হল ? ইস্ট বেঙ্গলের প্রাক্তন সচিব নিশীথ ঘোষ মুখ খুললেন। তরুণ দের সারাদিন

মস্কো থেকে খেলার আসর সম্পাদক চিরঞ্জীবের ডেসপ্যাচ এবং জার্মান ফুটবল নিয়ে একটি তথ্যবহুল রচনা।

একটি আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স এবং একটি ট্র্যাভেল এজেন্সির যুগ্ম উদ্যোগে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় অতীত এবং বর্তমানের বেশ কিছু সুপারস্টার ফুটবলারের খেলার কথা।খেলার আসরের প্রধান সম্পাদক অতুল মুখার্জি স্পেন বিশ্ব কাপ কভার করতে গিয়ে তাদের মধ্যে যাদের খেলা দেখেছেন তাদের নিয়ে স্মৃতিমন্থন করেছেন

কলকাতায় জাতীয় সাঁতার

এই সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে কমল ভট্টাচার্যর পরিচালনায় 'ক্রিকেট ক্লিনিক'

দু-পাতা জুড়ে রবি শাস্ত্রীর ব্রো-আপ। সাঁতারু খাজান সিংয়ের পুরোপাতা রঙিন ছবি।

এছাড়া 'অন্যান্য ওরেল', জানাবেন কি, নানা খবর

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

নভেমবর ৭ থেকে ১৩

মেষ : শারীরিক ভোগান্তি চলবে; মেয়েদের শরীর চলনসই। আয় বৃদ্ধি, কিন্তু পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য। কর্মক্ষেত্রে নানান ব্যাপারে সতর্কতা প্রয়োজন হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে অন্যেরা প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে। পারিবারিক কোন কর্ম প্রচেষ্টায় আশাতিরিক্ত সাফল্য। মেয়েদের সাংসারিক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা। ব্যবসায়ীদের অশান্তি হ্রাস।

বৃষ : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হ্রাস। আয় বাড়লেও নতুন করে ব্যয়ের চাপ। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে বিশেষ ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে নানান ঘটনা ভাবিয়ে তুলবে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ধর্ম-কর্ম ব্যাপারে আকস্মিক যোগা-যোগ। ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি।

মিথুন : শরীর সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন; মেয়েদের ছোটখাট শারীরিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থার সামান্য হেরফের; টানাটানি। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত; মেয়েদের কর্মস্থলে অসুবিধে-বাধা সত্ত্বেও কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। পারিবারিক ব্যাপারে অন্যের মতামতের প্রাধান্য। অপ্রত্যাশিত-ভাবে গুণীজন সান্নিধ্য। ব্যবসায়ী-দের মন্দা।

কর্কট : শরীর সুস্থ থাকবে; মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিক জটিলতা বৃদ্ধি; সঞ্চয়ে হাত পড়বে। কর্মক্ষেত্রে কোন সুখবর; মেয়েদের কর্মস্থলে কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আচমকা কোন ঘটনা ভাবিয়ে তুলবে। কর্মপ্রার্থীদের কোন যোগা-যোগে শেষ মুহূর্তে বাধা। ব্যবসায়ী-দের আর্থিক ক্ষতি।

সিংহ : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে। আর্থিক দুর্ভাবনা বিভ্রান্ত করবে। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে ভ্রমণের যোগাযোগ। মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ঘটনা উৎসাহিত করবে। পারিবারিক কোন পরি-কল্পনার সহজ রূপায়ণে স্বজনের বাধা-বিপত্তি। মেয়েদের দূর ভ্রমণ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কন্যা : শরীর চলনসই; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার অবনতি। আর্থিক ব্যাপারে প্রত্যাশিত ফল-লাভে বাধা। কর্মক্ষেত্রে আগের প্রয়াসে শুভ ফল; মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন প্রচেষ্টায় সাফল্যের আভাস। ব্যবসায়ীদের অবস্থার অবনতি।

তুলা : শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি; মেয়েদের শরীর নিয়ে ঝামেলা চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মনোমালিন্য; স্বার্থহানি। কর্মক্ষেত্রে কারও মধ্যস্থতায় কোন সমস্যার সমাধান; মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে ঝটিতি মতামত-সিদ্ধান্ত নিলে অশান্তি। বয়স্কদের নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার আশংকা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃশ্চিক : শারীরিক অশান্তি বাড়বে; মেয়েদের শরীর চলনসই। আয় বৃদ্ধির পথ আগের চেয়ে অনেক সুগম হবে। কর্মক্ষেত্রে কোন অশান্তি বহুলাংশে মিটে যাবে; মেয়েদের কর্মস্থলে দৃঢ়তায় কার্যসিদ্ধি। গৃহসংক্রান্ত কোন ঝামেলা মিটে যেতে পারে। মেয়েদের দূরের সংবাদে উদ্বেগ। ব্যাসায়ীদের অবস্থার পরিবর্তন।

ধনু : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক উন্নতি অব্যাহত থাকবে। সঞ্চয়ের পক্ষে সপ্তাহটি প্রতিকূল। কর্মক্ষেত্রে আচমকা কোন ঘটনা নিজ অনুকূলে আসবে; মেয়েদের কর্মস্থলে মনের দোটানায় সামান্য ক্ষতি সম্ভব। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মকর : শারীরিক অবস্থার উন্নতি; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আয় বৃদ্ধি পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য। কর্মক্ষেত্রে বিশিষ্ট-জনের সংসর্গলাভ; মেয়েদের কোন বকেয়া অর্থ প্রাপ্তি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কুম্ভ : শারীরিক দুশ্চিন্তা চলবে; মেয়েদের শরীর মোটামুটি। ব্যয়ের চাপ অনেকটা হ্রাস পাবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা; মেয়েদের কর্মস্থলে প্রত্যেক ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা, ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন হবে। পারিবারিক ব্যাপারে নিকটজনের সঙ্গে সমঝোতা। ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি।

মীন : অম্বল-অজীর্ণে ভোগান্তি; মেয়েদের শরীর নিয়ে নতুন অশান্তি। আর্থিক ব্যাপারে ঢিমে-তালে ভাবে ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে স্বার্থহানি। পারি-বারিক ব্যাপারে সন্তানদের মতামত প্রাধান্য পাবে। বন্ধুর জন্য গর্ব। ব্যবসায়ীদের না-লাভ-না-ক্ষতি। □

বিনয় আচার্য

ডাবর চ্যবনপ্রাশ

ব্যবহারেই প্রমাণ হয়ে যায়যে এই প্রাকৃতিক টনিক আপনার পরিবারের জন্যে অতি উত্তম।

ডাবর চ্যবনপ্রাশ থেকে আপনার পরিবার ভিটামিন আর হর্মোন পদার্থ প্রাকৃতিক রূপে পেয়ে থাকেন, যগুলি আপনার শরীর অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। এতে কোনো প্রকার কৃত্রিম রসায়ণ নেই এবং এই কারণে ডাবর চ্যবনপ্রাশ সেবনে কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। এর ব্যবহার লাভদায়ক এবং সর্বদিক থেকে নিরাপদ।

চ্যবনপ্রাশ — ৩০০০ বছরের পুরাতন স্বাস্থ্যবর্দ্ধক টনিক

চ্যবনপ্রাশ সম্পর্কে কথিত আছে যে, ৩০০০ বছর পূর্বে দেবতাগণের বৈদ্য এটি প্রস্তুত করেছিলেন চ্যবন ঋষির জন্য।

এর আশ্চর্যজনক সুফলের জন্য ঋষিগণ এর নাম দিয়েছিলেন "জীবন অমৃত"। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, এটি রোগমুক্তির শক্তি বাড়িয়ে তোলে, শরীরের মাংসপেশী মজবুত রাখে, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে।

ঋষিগণের সেই রহস্যময় প্রস্তুত প্রণালী ডাবর পুণরউদ্ভাবন করেছে

হাজার হাজার বছর চ্যবনপ্রাশ ঋষিগণের রহস্যে আবৃত ছিল। জনসাধারণ তখনই এর স্বাদ পেলেন, কয়েক দশক পূর্বে ডাবর যখন নিজেদের আধুনিক কারখানা স্থাপন করেন।

এখন ডাবর চ্যবনপ্রাশ আধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে প্রস্তুত হয়। এতে ৪০ এর অধিক গাছ-গাছড়া শেকড়-মূল মিশ্রিত থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল—আমলকী। তা'ছাড়া দশমূল, অষ্টবর্গ ইত্যাদি মিশ্রিত হয়।

আমলকীর রসে, কমলালেবুর রসের তুলনায় ২০ গুণ বেশী ভিটামিন সি থাকে

ডাবর চ্যবনপ্রাশের প্রধান উপকরণ আমলকী, ভিটামিন সি-র এযাবৎ জ্ঞাত সর্বোত্তম উৎস।

দু'বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ লাইনস পালিং-এর পরীক্ষা অনুসারে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভিটামিন সি কেবল সর্দি-জ্বরের-রক্ষক নয়, এতে শরীর নবশক্তি সঞ্চয় করে। শরীরে বার্দ্ধক্যের প্রক্রিয়া মন্থর করে তথা কাশি, শ্লেষ্মা, প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধের শক্তি যোগায়।

ডাঃ পালিং বলেন, আমাদের শরীরে ভিটামিন সি ঠিকমত সঞ্চালিত হলেই আমরা রোগের মোকাবিলা করতে সক্ষম হই। ভিটামিন সি আমাদের শরীরের গড়ন আর কর্মশক্তি তৈরী ক'রে রাখে।

আপনি স্বাস্থ্যবান হ'লেও আপনার প্রাকৃতিক টনিকের আবশ্যকতা আছে

অনেকে মনে করেন, টনিক কেবল রোগীদের দেওয়া উচিত, কিন্তু এইরকম ধারণা করা উচিৎ নয়। আয়ুর্বেদে সর্বদা উল্লেখ করা হয়েছে, সুরক্ষা, চিকিৎসা থেকে শ্রেয়। এই কারণে, আপনার পরিবার সুস্থ-সমর্থ হোক-না-কেন, তাঁদের ডাবর চ্যবনপ্রাশ সেবন করানো উচিত।

ডাবর চ্যবনপ্রাশ আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে। আর তাঁদের রোগ থেকে মুক্ত রাখে।

ডাবর

চ্যবনপ্রাশ

আপনার পরিবারের প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যবর্দ্ধক টনিক

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল ১২১

১		২	■	৩	৪		■
	■	৫	৬			■	৭
৮	৯			■	■	১০	
১১		■	১২		১৩		
	■	১৪			১৫		■
১৬	১৭	■	১৮	১৯		■	২০
২১		২২	■	২৩		২৪	
২৫				■	■	২৬	

সূত্র : পাশাপাশি

১। রাজার রাজা ৩। ভয়হীন ৫। গলায় গাল ? নাকি অসুখে গোলমাল ? ৮। অতলস্পর্শ গহীনতা ১০। লোক সরল নয় – ছলনাময় ১১। সুন্দর, দশরথপুত্র ১২। মুসলমানদের দুটি প্রিয় তীর্থস্থান। ১৪। ব্যাপার হল : গাছের গুঁড়িতে ঘটনা ১৫। চাকার মধ্যের দন্ড ১৬। মানুষ যা খোঁজে, যার থেকে স্বস্তি ভাল ১৮। পর্ব ভাঙ ২১। মত্ততা ২৩। একটি পবিত্র স্থান বা আশ্রম ২৫। স্বর্ণ, পদ্ম ২৬। চিঠির শেষ

সূত্র : ওপর-নিচ

১। সমুদ্রঘেরা মায়ের মত এই পৃথিবী ২। ছোট্ট সাদা ফুল ৩। গতিহারা পাহাড় ৪। ঠগ জোচ্চর ৬। বল্লরী বিতান ৭। ডাল নয়, অন্য ব্যঞ্জন ৯। গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের প্রতিপক্ষ ১০। খয়ের ১৩। মধুর বনানী, নাচে রাধারাণী ১৭। একদম শেষ বা হত্যা ১৯। বাইরের বারান্দা ২০। জল নিতে লাগে ২২। মানুষ ২৪। খুব বেশি কথা, কীসের মত ফোটে ? না যদি বলতে পার 'লাজ' পাবে

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ৫ ডিসেমবর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ২২ নভেমবর '৮৪।

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খলের নমবরটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শব্দশৃঙ্খল ১১৭ (সমাধান)

শব্দশৃঙ্খল ১১৭-র জন্য ২০ টাকা করে পুরস্কার পাবেন নন্দ দুলাল রায় (ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা), শুভ্রা দাস (কলকাতা ৫৬), বাবী মল্লিক (কাটোয়া, বর্ধমান), অশোক ঘোষ (কলকাতা ৬) এবং এস এস ঘটক (হাওড়া ৪)।

রা	■	অ	ম্ব	ল	■	আ	ধা
জা	হা	জ	■	ক্ষ	ত	স্থা	ন
■	ল	গ	ন	■	প	■	■
জ্যো	■	র	গ	■	ন	জি	র
তি	ল	■	ণ্য	■	কি	রা	■
ব	স	ন	■	সা	র	■	ম
সু	■	ক	■	র	ণ	ত	রী
■	জা	ল	■	দা	■	প	য়া

সারটিফিকেট পাবেন কৌশিক বন্দোপাধ্যায় (সিউড়ী, বীরভূম), কৌশিক দাস (কাঁথি, মেদিনীপুর), সুকুমার চ্যাটারজি (খড়গপুর, মেদিনীপুর), ময়া গুণ (নিউ টাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি), সমীর দাস (খড়গপুর, মেদিনীপুর), আরতি ঘোষ (কলকাতা ৯১), দুলাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (কলকাতা ১), শশাংক সেনাপতি (ঝালদা, পুরুলিয়া), বিকাশ ভট্টাচার্য (কনাপুর, বর্ধমান) এবং অজয় ভৌমিক (ইছাপুর, ২৪ পরগণা)।

শব্দশৃঙ্খল ১১৭-র লটারির বিচারক ছিলেন শ্যামল মুখারজি।

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন

১। বিশ্বে ভারতীয় রেলপথের স্থান কী ?

২। কোন অভিনেত্রী প্রথম দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছিলেন ?

৩। ইনডিয়ান স্ট্যানডারডস ইনসটিটিউট-এর সদর দফতর কোথায় ?

৪। কার চিন্তাধারায় মহাত্মা গান্ধী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ?

৫। রিজারভ ব্যাংক কোন বছর স্থাপিত হয়েছিল ?

৬। কোন খেলায় একজন খেলোয়াড়কে 'ডামি' হিসেবে ব্যবহার করা হয় ?

৭। 'ড্রাই আইস' কাকে বলা হয় ?

৮। পৃথিবীর সব থেকে বড় নদী কোনটি ?

৯। বৃটিশ আমলে ভারতে প্রথম ভাইসরয় হয়ে কে এসেছিলেন ?

১০। 'ফতেপুর সিক্রি'-র স্রষ্টা কে – আকবর, শাহজাহান না ঔরংগজীব ?

১১। ভারতে কোন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির আমলে সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয় ?

১২। নাগপুর, দিললি, কলকাতা, বোমবে, মাদরাজ – এর মধ্যে কোন জায়গার বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নয় ?

১৩। এই বন্দরগুলির মধ্যে কোনটি ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত নয় – বোমবে, কান্ডলা, কালিকট, ম্যাংগালোর, ভাবনগর, কুদ্দলর, কুইলন ?

১৪। ১৯৮১ সালের লোকগণনা রিপোরট অনুযায়ী ভারতে শিক্ষিতের হার কত ?

১৫। গ্যাস বেলুনে কোন ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হয় ?

সংকলক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

উত্তর

১। চতুর্থ বৃহত্তম।

২। দেবীকারানী।

৩। নয়া দিললি।

৪। প্রখ্যাত রুশ লেখক ও দার্শনিক লিও তলস্তয়।

৫। ১৯৩৫।

৬। বৃজ।

৭। কারবন ডাইঅকসাইড-কে।

৮। মিসিসিপি নদী।

৯। লরড ক্যানিং।

১০। মুঘল সম্রাট আকবর।

১১। লরড উইলিয়াম বেনটিংক।

১২। নাগপুর বিমানবন্দর।

১৩। কুদ্দলর।

১৪। ৩৬.১৭ শতাংশ।

১৫। হাইড্রোজেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৬৫ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-5092 IPPL IN

হীরামনের হাহাকার
কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস
৫২
আপনি কী করলেন?
মরীচির দিকে তাকালেনই না খেমচাঁদ।
আমি সংগে সংগে খোঁজ নিলাম।
ট্রাংক ইনফরমেশন? আমি খেমচাঁদ রাজকুমার বলছি……
বলুন, স্যার।
রাজস্থান থেকে এইমাত্র আমার নামে কোন ট্রাংককল এসেছিল? *
না তো।
* এই কাহিনী যখনকার, তখন STD সিসটেম ছিল না।
দূরপাল্লার ফোন-কল অত স্পষ্ট হয় না। তাই অনুমান করলাম, কলকাতা থেকেই কেউ ফোন করেছে।
ভীম দত্ত তাহলে এখন কোথায়? রাজস্থানের মরুভূমিতে, না কলকাতায়?
রহস্যসন্ধানী ইন্দ্রনাথ রুদ্রই সে সমস্যার সমাধান করবেন।
এবার বুঝছো তো, অখন্ড উধাও হয়ে যাওয়ায় কেন আমি উদ্বিগ্ন?
দোরগোড়া থেকে প্রাণোচ্ছল কণ্ঠে ভেসে এল জবাবটা।
উধাও আমি হইনি, ড্যাডি। এই দেখুন সশরীরে ফিরে এসেছি।
অখন্ড এর পর যা বলল, তা সত্যিই রোমাঞ্চকর লুকোচুরির কাহিনী!

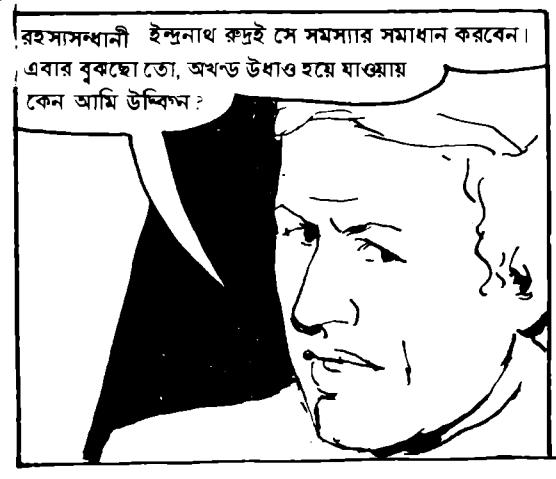

(চলবে)

নিকৃষ্ট সুতো ফিকে হ'য়ে যেতে পারে
কোট্‌স সুপারশীন-এ কিন্তু তা হয় না!

সুপারশীন পছন্দ করুন !

মার্সিরাইজ্‌ড্‌ বিশেষভাবে লুব্রিকেটেড ৩-প্লাই সুতো—এই সুপারশীন। এটি টেঁকসই, এ দিয়ে সেলাই করলে কোন ঝঞ্ঝাট হয় না আর এটির রঙও পাকা।

ব্লাউজ, ফ্রক, শার্ট ইত্যাদির জন্যে পছন্দ করুন সুপারশীন। যে কোন হাল্কা ফেব্রিকের কাজে সুপারশীন আদর্শ।

বলতে ভুলবেন না — 'সুপারশীন-এ সেলাই করুন'

কোট্‌স
সুপারশীন

কোট্‌স-সেরা সুতোর উৎপাদক

মাদুরা কোট্‌স-এর উৎপাদন

CHAITRA-B MCL 2B BEN R1